দাম : দশ টাকা

৬৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা ।।
২৭ অক্টোবর ২০১৪ ।।
১০ কার্তিক ১৪২১ ।।
website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

অনুপ্রবেশের কুফল

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ৯ কার্তিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২৭ অক্টোবর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

সি পি এমের চেনা পথেই তৃণমূলের রাজনীতি চলছে
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : কাকেরা ঘেরাও করবে সি বি আই অফিস
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

বঙ্গে শিল্পসঙ্কট : জমি-নীতি নয়, সমস্যা অন্যত্র
▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১২

পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদ্রাসা শিক্ষা
▯ বিমল প্রামাণিক ▯ ১৪

ঘরের মধ্যে বিদেশী ও বোমা পথেঘাটে, কিন্তু তেমন কলরব নেই ▯ মোহিত রায় ▯ ১৬

দেবী জগদ্ধাত্রী ▯ সন্দীপ কুমার দাঁ ▯ ২১

যোগাসন আজ জরুরি ▯ ২৩

হায় নালন্দা! ▯ নলিন মেহতা ▯ ২৭

জাওয়াহিরির ঘোষণা জামায়েতের স্বপ্নেরই ধারাবাহিকতা
▯ ২৯

নাইজিরিয়ায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিপদ বেড়েই চলেছে
▯ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯
অন্যরকম : ৩৩ ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮**▯ **খেলা : ৩৯**

প্রকাশিত হবে
৩ নভেম্বর
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মোদীর ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’

বিপুল নির্বাচনী সাফল্যের মুহূর্তেই ভাবী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বার্তা দিয়েছিলেন— ‘সুদিন আসছে’। এই বার্তা নিছক কথার কথা ছিল না। এর পেছনে ছিল সুদূরপ্রয়াসী ও দীর্ঘমেয়াদী কিছু পরিকল্পনা। দেশের উৎপাদন শিল্পে জোয়ার আনার জন্য সেই পরিকল্পনারই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’। এ নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ — মোদীর মেক ইন ইন্ডিয়া।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

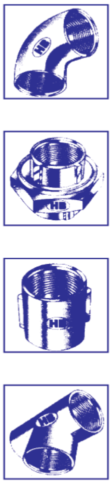

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE ® PURE
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিজেপি'র বিজয় অব্যাহত

সাফল্যের তুল্য সাফল্য আর কিছুই হইতে পারে না। নমো সুনামিতে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানাতেও গেরুয়া ঝড় অব্যাহত রহিয়াছে। লোকসভা ভোটের পরে কিছু রাজ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটি উপনির্বাচনে বিজেপির খারাপ ফল হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু তাহাতে এখনই নরেন্দ্র মোদীর উপর ভারতবাসীর আস্থা চলিয়া যায় নাই। বরঞ্চ দিনে দিনে সেই আস্থা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানার ভোটের ফল তাহারই প্রকাশমাত্র। অপরদিকে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলটি হিন্দি বলয় হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল হরিয়ানায় পরাজয়ের ফলে। হরিয়ানায় বিজেপির জয় প্রমাণ করিয়াছে বর্তমান সময়ে জাতপাত ভিত্তিক ভোট অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে, বরঞ্চ উন্নয়নই প্রধান। বিদ্যুৎ, সড়ক ও সেচের কোনো উন্নয়ন না হইবার কারণে মানুষ উন্নয়নের প্রতীক নরেন্দ্র মোদীতেই আস্থা রাখিয়াছেন। চাকরির বাজারও এখন সেই ভাবে না থাকায় তরুণ প্রজন্ম ঝুঁকিয়াছে মোদীর কর্মসংস্থানের আশ্বাসে। এই দুই রাজ্যে বিজেপির জয়লাভ অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি পালনে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অনেকটাই সুযোগ করিয়া দিবে। মহারাষ্ট্রেও দুর্নীতি ও মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক বিষয়ে কংগ্রেস-এনসিপি শাসনে মানুষ বীতশ্রদ্ধ ছিল। সেই দিল্লী বিধানসভা নির্বাচন হইতে শুরু করিয়া বিগত লোকসভা নির্বাচন অবধি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনাদেশের যে প্রতিফলন ঘটিয়াছে, তাহার একটি ধারাবাহিক তাৎপর্য ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সাধারণত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের বিচার করা যাইতে না পারিলেও গত চার মাসে যে ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার চলিতেছে, যে ভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমস্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন এই ফলাফল সেইসবের স্বীকৃতি। মহারাষ্ট্রে জোট ভাঙিয়া যাওয়া প্রসঙ্গে নানা আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা চলিয়াছে এবং এই বিষয়ে আলোচনা ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে। কিন্তু বাস্তব হইল বিজেপির একলা চলো নীতি দলকে কাঙ্ক্ষিত ফল আনিয়া দিয়াছে যাহা বিজেপির অনুমানের তুলনায় অধিক। এককালে মারাঠি ভোটব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ছিল শিবসেনার হাতে, আজ কিন্তু মহারাষ্ট্রের এক নম্বর দলে পরিণত হইয়াছে বিজেপি আর শিবসেনা পরিণত হইয়াছে ছোট দলে। যাহা হইতে স্পষ্ট মহারাষ্ট্রের মারাঠি অস্মিতার দখল লইতে সফল হইয়াছে বিজেপি। শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাহিয়া বসিয়াছিলেন, ভোটাররা তাহার মুখের মতো জবাব দিয়াছেন। আরও একবার প্রমাণ হইল, অহঙ্কারই পতনের মূল। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে শরদ পাওয়ার বিজেপি-কে বাহির হইতে সমর্থনের বার্তা দিয়া এমন চাল খেলিয়াছেন যে শিবসেনার দর কষাকষির ক্ষমতাটাই কাড়িয়া লইয়াছেন। বিজেপি চাহিয়াছিল এককভাবে সরকারে আসিতে পারিলে শিল্প ও বাণিজ্য-সহ একাধিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নীতি প্রয়োগ করিতে অনেক বেশি সহজ হইবে। আজ কিন্তু আশঙ্কা থাকিল না। একক গরিষ্ঠদল না হইলেও এই মুহূর্তে শরিকের উপর নির্ভর করিতে হইবে না।

কংগ্রেসের এই পরাজয় অবশম্ভাবী ছিল কিন্তু মহারাষ্ট্রের পরাজয় দেশ হইতে কংগ্রেসের বিদায় লইবার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতেছে। কারণ এক সময়ে কংগ্রেসের পত্তন হইয়াছিল এই মারাঠা মুলুকেই। মাঝে দুই মেয়াদ ছাড়া স্বাধীনতার পর বরাবর কংগ্রেসি রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল মহারাষ্ট্র। আজ পশ্চিম ভারতেই কংগ্রেস অবলুপ্ত, উত্তর ভারতেও তাই। বস্তুত সমগ্র ভারতেই কংগ্রেস আজ বিলুপ্তির পথে। লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা হইবার মতো আসন তাহারা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। বস্তুত কংগ্রেসকে গ্রহণ না করিবার বিষয়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ একমত।

এতদিন কংগ্রেস বনাম বিজেপি বিতর্ক শুধু ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই ঘোরাফিরা করিত। এখন শুধুমাত্র আদর্শগত নয়, সুশাসন ও উন্নয়নের ভিত্তিতে বিজেপি যে কংগ্রেসের একটি বিকল্প মডেল খাড়া করিতে ক্রমশ সক্ষম হইতেছে ইহা অত্যন্ত আশার কথা।

সুভাষিত

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।

বঞ্চনং চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।। (চাণক্যনীতি)

নিজের দারিদ্র্য, মনের দুঃখ, গৃহের অশান্তি বা কলঙ্ক, নিজে বঞ্চিত হওয়ার এবং অপমানের ঘটনা—জ্ঞানী ব্যক্তিরা এগুলি অপরের কাছে কখনো প্রকাশ করেন না।

মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানাতেও বিজেপি'র বিজয়রথ ছুটেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় যে ভাবে বিজেপির বিজয়রথ ছুটেছে, তাতে ঝাড়খণ্ড, বিহার ও বাংলার মতো রাজ্যগুলির আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়ে ভাল ফল করার ব্যাপারে বিজেপি নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো। মহারাষ্ট্রে গতবার (২০০৯) বিজেপি'র আসন সংখ্যা ছিল ৪৬। এবারে সেটা প্রায় তিন গুণ বেড়ে হয়েছে ১২২।

অন্যদিকে শিবসেনা ৬৩, কংগ্রেস ৪২, এনসিপি ৪১, এম এন এস ১ এবং বাকি অন্যরা ১৯। আগে শিবসেনার সঙ্গে জোট ধর্ম পালনের জন্য মহারাষ্ট্রের ২৮৮ বিধানসভা আসনের মধ্যে শ'খানেক লড়ত বিজেপি। এবার একক ভাবে দু'শোর কাছাকাছি আসনে লড়ে ১২২ আসন জয়লাভ তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দলের ভোট ২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮ শতাংশ।

অন্যদিকে হরিয়ানার রাজনীতির সমস্ত চেনা ছক উল্টে দিয়েছে ২০১৪ সালের বিধানসভা নির্বাচন। যে রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও মাত্র ৪টি আসনে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল বিজেপিকে, সেখানে ভজনলাল, বংশীলাল ও দেবীলালদের সংসার তছনছ করে ইতিহাসে এই প্রথম একক ভাবে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। হরিয়ানার মোট আসন সংখ্যা ৯০। এর মধ্যে বিজেপির ঝুলিতে রয়েছে ৪৭টি আসন। আই এন এল ডি ১৯, কংগ্রেস ১৫, বিএসপি ১, এইচ জে সি ২, এস এ ডি ১, নির্দল ৫। হরিয়ানায় গত দশ বছরের শাসক কংগ্রেস এমনই মুখ থুবড়ে পড়েছে যে, প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদাটিও ধরে রাখতে পারেনি। হেরে গেছেন ভূপেন্দ্র সিং হুডা সরকারের ৯ জন মন্ত্রী। লোকসভা ভোটের মতো এ রাজ্যেও শেষ কথা বলেছে দুর্নীতি ইস্যু। দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দী ওমপ্রকাশ চৌতালা ও অজয় চৌতালা জামিন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নির্বাচনী প্রচারের স্বার্থে। তাঁদের নিরপরাধ আক্রান্ত দাবি করে সহানুভূতি ভোট টানার চেষ্টাও কম হয়নি। কিন্তু দুর্নীতির কালি যে এত সহজে ভোটারদের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না ভোটের ফলাফল তা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

এই নির্বাচনে মহারাষ্ট্রের ছয় অঞ্চলে ভোটদানের প্রবণতা থেকে উঠে আসছে রাজ্যের রাজনৈতিক অভিমুখ নিয়ে নানা নতুন দিক চিহ্ন। মারাঠাওয়াড়া, বিদর্ভ, পশ্চিম মহারাষ্ট্র, উত্তর মহারাষ্ট্র, উপকূলীয় কোঙ্কন-থানে ও বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ের ভোট পড়ার অঙ্ক থেকে স্থানীয় মানুষদের মন বোঝার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

মহারাষ্ট্রের ফল	হরিয়ানার ফল
মোট আসন-২৮৮	মোট আসন-৯০
বিজেপি-১২২	বিজেপি-৪৭
কংগ্রেস-৪২	কংগ্রেস-১৫
এনসিপি-৪১	আই এন এল ডি-১৯
শিবসেনা-৬৩	বিএসপি-১
সিপিএম-১	এইচজেসি-২
এম এন এস-১	এন এ ডি-১
এ আই এম ও	নির্দল-৫
আই এম-২	
বিভিএ-৩	
অন্যান্য-১৩	

মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে মোট আসন ৪৬। সেখানে দলগুলির প্রাপ্ত আসন এরকম— বিজেপি-১৪, শিবসেনা-১২, কংগ্রেস-৮, এনসিপি-৯, এম এন এস-০, অন্যান্য-৩। বিদর্ভ--- মোট আসন ৬২। এর মধ্যে বিজেপি-৪৩, শিবসেনা-৪, কংগ্রেস-১০, এনসিপি-১, এম এন এস-১, অন্যান্য-৩।

মুম্বই --- মোট আসন সংখ্যা ৩৬। বিজেপি-১৫, শিবসেনা-১৩, কংগ্রেস-৫, এনসিপি-০, এমএনএস-০, অন্যান্য-৩। উত্তর মহারাষ্ট্র--- মোট আসন ৩৫। বিজেপি-১৪, শিবসেনা-৭, কংগ্রেস-৭, এন সি পি-৫, এমএনএস-০, অন্যান্য-২। কোঙ্কন-থানে--- মোট আসন ৩৯। বিজেপি-১০, শিবসেনা-১৪, কংগ্রেস-১, এনসিপি-৮, এমএনএস-০, অন্যান্য-৬।

রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে বিদর্ভ অঞ্চলকে নিয়ে নতুন রাজ্য গঠনের দাবি অনেক দিনের। মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম বিদর্ভ। প্রতি বছরই কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা উঠে আসে এই অঞ্চল থেকেই। এই অঞ্চলে ভোটে শেষ কথা বলেছে এই দুই বিষয়ই। নরেন্দ্র মোদীর দুর্নীতি বিরোধী অবস্থান ও উন্নয়নের মন্ত্র সেখানে আশার আলো দেখিয়েছে। পৃথক রাজ্যের বিপক্ষে ছিল শিবসেনা। এই অঞ্চলের মানুষ তার জবাব দিয়েছে শিবসেনাকে মাত্র ৪টি আসন জিতিয়ে।

অন্যদিকে মুম্বই বরাবরই শিবসেনার শক্ত ঘাঁটি। সেখানে বিজেপি শিবসেনার থেকে ২টি আসন বেশি পেয়েছে। রাজ ঠাকরের এম এন এস মুম্বইয়ের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে অস্তিত্বের সঙ্কটে এখন রাজ ঠাকরে। পশ্চিমে মহারাষ্ট্রে ধুয়েমুছে গিয়েছে এখনকার মূল শক্তি বলে পরিচিত শরদ পাওয়ারের এনসিপি।

১৯৬৬ সালের ১ নভেম্বর পাঞ্জাব রাজ্যকে ভেঙে আলাদা রাজ্য হিসেবে হরিয়ানার আত্মপ্রকাশ। সেই সময় থেকে এই প্রথম জোটসঙ্গী ছাড়া একা লড়ে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজেপি এই প্রথম সরকার গঠনও করল।

উত্তর ভারতের প্রাধান্য থাকলেও হরিয়ানার মতো রাজ্যে বরাবর ছোট দল হিসেবেই গণ্য হোত বিজেপি। কিন্তু এবারে এ রাজ্যের ভোট অঙ্কটাই আগাগোড়া বদলে দিয়েছে বিজেপি। জাঠ ও অ-জাঠ— দুই গোষ্ঠীরই মন জয় করতে পেরেছে। ■

বর্ধমান-বিস্ফোরণে জঙ্গি যোগসাজশ স্পষ্ট

‘বাঙালি’ নেতৃত্বে রাজ্যে হিংসা ছড়াচ্ছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাক জঙ্গি গোষ্ঠী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী যোগাযোগের স্পষ্ট প্রমাণ মিলল এবার। ইন্টারনেট কথোপকথনের (চ্যাট) যে সারণি গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে তাতে দেখা গিয়েছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন বাংলাদেশ এবং অসম ও পশ্চিমবঙ্গে তাদের নতুন সন্ত্রাসবাদী শাখা খুলেছে। এই শাখার নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিটিকে ‘বাঙালি’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর-সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পাকিস্তানে জঙ্গি যোগসাজশের জন্য ওই সংগঠনটি রীতিমত কুখ্যাত। কিন্তু এতদিন বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতে তাদের অস্তিত্ব সেভাবে টের পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের প্রেক্ষিতে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের পূর্ব-ভারতের অনুপ্রবেশ-প্রভাবিত এলাকা ও বাংলাদেশে শাখা খোলাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল। ইন্টারনেটে ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে কথোপকথনের যেটুকু পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)-এর আধিকারিকেরা তাতে দেখা যাচ্ছে ওই বছর ‘বাঙালি’র নেতৃত্বে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানোর পরিকল্পনা নেয় মুজাহিদিন। ওই কথোপকথনের পাঠোদ্ধারের সূত্রে গোয়েন্দারা এও অনুমান করছেন ২০১২-তে মোবাইলের এস এম এস প্রচারের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণের শহরগুলিতে যেমন ব্যাঙ্গালুরু ইত্যাদিতে উত্তর-পূর্বের বাসিন্দাদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজও করেছিল মুজাহিদিনের জঙ্গিরা।

ইন্টারনেট চ্যাটের সূত্রে দেখা যাচ্ছে— ২০১৩-র ১২ জুলাই আহমেদ সিদ্দিবাপ্পা ওরফে ইয়াসিন ভাটকল ও আফিফ জিলানি মোটা ওই দুই সন্ত্রাসবাদী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নতুন শাখা ‘বাঙালি’র নেতৃত্বে কতটা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তা নিয়ে গভীর আলোচনা করেছে। প্রসঙ্গত, গত বছরের আগস্টে নেপাল থেকে গ্রেপ্তার হয় ভাটকল এবং মোটা বর্তমানে পাকিস্তানে লুকিয়ে রয়েছে বলে গোয়েন্দাদের ধারণা। ওই কথোপকথনে ইয়াসিন ভাটকল প্রশ্ন করে— আফিফ মোটার গোষ্ঠীর নতুন প্রধান ভারতের কোনো ‘জেহাদি’ অপারেশনে’ অংশগ্রহণ করেছে কিনা। মোটা প্রত্যুত্তর দেয় এই নেতা ২০১২-র আগস্টে জাল এস এম এসের মাধ্যমে ভারতে হিংসা ছড়ানোর পরিকল্পনা করে। তার সেই পরিকল্পনায় ছিল মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যার ঘটনার সঙ্গে অসমের মানুষদের জড়িয়ে ফেলে ‘প্যানিক’ ছড়ানো। এর ফলে ভারতের দক্ষিণী রাজ্যগুলি থেকে উত্তর-পূর্বের বাসিন্দারা একপ্রকার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উৎখাত হন। এই নতুন নেতাটির পরিচয় গোপন রাখতে এককথায় অভূতপূর্ব ব্যবস্থা নেয় জঙ্গিরা। মোটা সেই ইন্টারনেট কথোপকথনে দাবি করে যে, এই নতুন নেতার পরিচয় এমনকী পাকিস্তানের আই এস আই-এর কাছেও উদ্‌ঘাটন করা হয়নি। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের অন্য দুই সক্রিয় জঙ্গি নেতা মীরজা সাদাব বেগ এবং আসাদুল্লা আখতারের ২০১৩-র ১২ জুলাই ইন্টারনেট কথোপকথনের সূত্রে গোয়েন্দারা জেনেছেন, ‘বি এন জি’ থেকে আসা নতুন এক নেতা ভারতে জঙ্গি- কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছে। পরে তারা ‘বি এন জি’-র অর্থ উদ্ধার করতে পারেন যে এটি ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল’ বা পশ্চিমবঙ্গ বোঝাচ্ছে। বেগ আখতারকে জানায় এই নেতাটি ‘নরম প্রকৃতি’র এবং করাচির বিষয়টি দেখছে। ২০১৩-র ১৮ জুলাই আসাদুল্লার সঙ্গে মীরজা বেগের অন্য একটি ইন্টারনেট কথোপকথনে দেখা যাচ্ছে বেগ নিজেকে ও অন্যদের জড়িয়ে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের একটি শাখার প্রধান হিসেবে জনৈক ‘বাঙালি ব্যক্তি’র নিয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করেছে। আখতার যখন তার কাছে এই নতুন শাখাটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য সেই প্রশ্ন তুলেছিল তখন বেগের জবাব ছিল এর সদস্যরা তাদের নিজেদের এলাকায় বিভিন্ন কেসে ‘ওয়ান্টেড’ থাকলেও সার্বিকভাবে এদের সম্বন্ধে ভারতীয় পুলিশের কাছে কোনো তথ্য নেই।

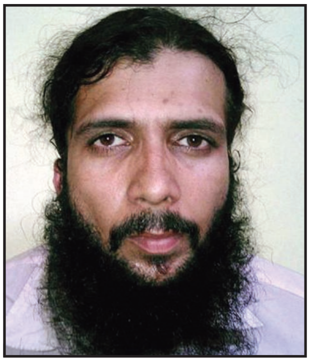

ইয়াসিন ভাটকল

ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি চার্জশিটে এন আই এ-র গোয়েন্দারা আখতারের সঙ্গে বেগের ইন্টারনেট কথোপকথনের একটি মারাত্মক কথা উদ্ধৃত করেছেন— ‘এই গোষ্ঠী তাদের কাজ সম্পর্কে সচেতন। ভারতে একটি গোষ্ঠী ‘ফিদায়েঁ বাহিনী’ তৈরি করে ফেলেছে। একজন বাঙালি এই কাজটি করেছে।’ গত ২ অক্টোবর বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে নেমে এন আই এ-র গোয়েন্দা নিশ্চিত যে ১০ অক্টোবর অসমের বরপেটা জেলা থেকে যে ছ'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের জামাত-উল মুজাহিদিন ও বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। সইখুল ইসলাম ওরফে আবদুল্লা গ্রেপ্তার হয় অসম থেকে। শাকিল আহমেদ ওরফে শামিনের সহযোগী হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে সে। এই শামিন বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিনের এক সক্রিয় সদস্য ও বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডে তার মৃত্যু হয়। তাই বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ড ও এইসব তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে গোয়েন্দাদের দৃঢ় ধারণা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা জনৈক ‘বাঙালি’ নেতার নেতৃত্বে এরাজ্যকে অশান্ত করতে ষড়যন্ত্র করছে। ■

হিন্দুস্থান সমাচার

বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার কলকাতা কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ১ নভেম্বর ২০১৪ শনিবার বিকাল ৫টায় **মিডিয়া মালিকানা ও স্বাধীনতা** বিষয়ের ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মহাশয়। সভায় পৌরোহিত্য করবেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী রঞ্জিত রায় মহাশয়। আলোচনা সভার বক্তা : শ্রী প্রকাশ জাভড়েকর (তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী, ভারত সরকার) শ্রী পুষ্পেন্দু কুলশ্রেষ্ঠ (প্রবীণ সাংবাদিক, ইন্ডিয়া হেড : আজ টি ভি) শ্রী অসীম কুমার মিত্র (প্রবীণ সাংবাদিক)

আলোচনা সভার স্থান : অসোয়াল ভবন সভাগৃহ (২ বি, নন্দমল্লিক লেন, কলকাতা-৬, গণেশ টকিজের নিকট।

উক্ত সভায় সবান্ধবে অংশগ্রহণ করে আমাদের প্রয়াস সফল করুন।

ভ্রমসংশোধন

গত ২০ অক্টোবর ২০১৪ স্বস্তিকার 'দীপাবলি সংখ্যা'য় সূচীপত্রে ভুলবশত 'দেশের নবনির্মাণের জন্য সারা সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে : মোহন ভাগবত সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়' ছাপা হয়েছে। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি হবে না। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—স্বস্তিকা সম্পাদক

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর,

জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭

মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

SUPERSPEED CARRIERS PRIVATE LIMITED

2 Roopchand Roy Street, 3rd Floor, Room No. 309, Kolkata - 700 007

Phone : 32476907, Telefax : 2270 1163, Mobile : 98302 76002

E-mail : superspeed@dataone.in

অসম ও পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা চিত্রের পরিবর্তন

উদ্বেগ বাড়ছে দেশের রাজনৈতিক মহলে

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।। বাংলাদেশে লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের মতো সীমান্ত রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা চিত্রের দ্রুত পরিবর্তনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সম্প্রতি সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত বিজয়াদশমীর সমাবেশে এই উদ্বেগ প্রকাশ্যে ব্যক্তও করেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন আর এস এস প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে অসম, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা চিত্রের পরিবর্তনের পাশে ধর্মীয়, সামাজিক সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে মত ব্যক্ত করে এসেছেন। আর এস এসের অভিযোগ যে, অসমে ক্ষমতাসীন তরুণ গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক কারণে ও মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কের কারণে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ ও জনসংখ্যার চিত্রের দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকার এখন বেশ কিছুটা তৎপর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এ নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। যদিও এই টাস্ক ফোর্সের মূল লক্ষ্য নতুন করে অনুপ্রবেশ ঠেকানো। কিন্তু অসম ও পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ ভাবে ঢোকা ২ কোটি অনুপ্রবেশকারীকে বিতাড়নের ব্যাপারে কেন্দ্রের মোদী-সরকার কতটা সফল হবেন তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহল কিন্তু মনে করছে যে ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে, অসমে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে উদার হিন্দুত্ব ও বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকে কাজে লাগাতে তৎপর বিজেপি। তাই মুসলমান অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধান বা অবৈধ নাগরিকদের বিতাড়নের ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া হবে এমন মনে করছেন পর্যবেক্ষক মহল। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মুসলমান জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর কার্যত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হয়েছে। মুসলমান জনসংখ্যা মালদহে ৫৩ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৫৭ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৫১ শতাংশ। এছাড়া নদীয়ায় ৩৯ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনায় ৪১ শতাংশ, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪৩ শতাংশ, হাওড়া ৩৮ শতাংশ, হুগলীতে ৪১ শতাংশ, বর্ধমানে ৩৭ শতাংশ, বীরভূমে ৪০ শতাংশ, পূর্ব মেদিনীপুরে ২৯ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৮ শতাংশ, পুরুলিয়া ১৯ শতাংশ, বাঁকুড়ায় ২১ শতাংশ, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় ১২ শতাংশ, জলপাইগুলিতে ২৭ শতাংশ, কোচবিহারে ২০ শতাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৩ শতাংশ। সরকারি মতে পশ্চিমবঙ্গে ৩০ শতাংশ হলেও বেসরকারি মতে তা প্রায় ৩৫ শতাংশ এসেছে।

বাংলাদেশ সীমান্ত জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির বড় কারণই অনুপ্রবেশ। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার অন্তত ৮ থেকে ৯ শতাংশই অনুপ্রবেশকারী এমনটাই মনে করছেন পর্যবেক্ষক মহল। অন্যদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার তথা বাংলাদেশ লাগোয়া স্পর্শকাতর রাজ্য অসমেও দ্রুতগতিতে মুসলমান জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, অসমের পরিস্থিতিও ভয়াবহ। সীমান্ত রাজ্যে অসমে জনসংখ্যা চিত্রের দ্রুত পরিবর্তন ঘটায় সামাজিক ও ধর্মীয় সংঘাত তথা মেরুকরণের সম্ভাবনা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০১৬ সালে অসম বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি হিন্দুত্ব ও বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের ওপর প্রচার জোরদার করতে চাইছে। অসমে সামাজিক ভাবে ৭ শতাংশ হারে বেড়েছে মুসলমান জনসংখ্যা।

অসমে মুসলমান জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মোদী-সরকার। দলগতভাবে কংগ্রেস, ইউ ডি এফ-সহ একাধিক বিজেপি-বিরোধী দল ধর্মীয় মেরুকরণে রাজনৈতিক বাজিমাতের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে।

অসম-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ২০-২৮ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। যদিও অসমের কংগ্রেস, এ ইউ ডি এফ নেতৃত্বে এর পেছনে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছেন না। অসমের মতো পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে মুসলমান জনসংখ্যা। তার বড় অংশই বাংলাদেশ থেকে ঢোকা অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। ২০০১-এর জনগণনার পর ২০১১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের মতো অসমেও প্রতিটি জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে। ২০০১ সালে অসমের জনসংখ্যা ছিল, ২,৬৬,৩৮,৮০৭ জন। যেখানে ২০১১ সালে তা দাঁড়ায় ৩,১১,৬৯,২৭২। বৃদ্ধির হার ১৬.৯৩ শতাংশ। বিগত তিন বছরে অসমে আরো দশ শতাংশ জনসংখ্যা বেড়েছে। অসমের ২৭টি জেলার ৮ জেলায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি হলেও ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া বরপেটা, মরিগাঁও, নগাঁও, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে ৩০ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ২০ থেকে ২৪ শতাংশ যার অধিকাংশই মুসলমান। পূর্ব অসমের জেলাগুলির সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে অস্বাভাবিক মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জনসংখ্যা চিত্রের পরিবর্তনে ধর্মীয় ও সামাজিক মেরুকরণের সম্ভাবনাও জোরদার হয়ে উঠেছে। নতুন কেন্দ্রীয় সরকারও অসম, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশজনিত সমস্যা ও সীমান্ত জেলাগুলিতে জনসংখ্যা চিত্রের ব্যাপক পরিবর্তনে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ■

সিপিএমের চেনা পথেই তৃণমূলের রাজনীতি চলছে

মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির জয়ের সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল তৃণমূলের হতাশা স্পষ্ট। রাজ্যের নেতৃত্ব এখন কংগ্রেস ও সিপিএমকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাইছে। কিন্তু এমন অসম রাজনৈতিক বন্ধুত্ব পরিণামে তৃণমূলের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে সে কথা বলবে কে? আগামী বিধানসভার ভোটে তৃণমূল বাম ও কংগ্রেসের হাত ধরলে দু'টি দলেই ভাঙন অনিবার্য। ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে প্রদেশ কংগ্রেস দলে কোন্দল শুরু হয়েছে। সোনিয়া গান্ধী চাইছেন রাজ্য কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে নিঃশর্ত জোট করুক। তাঁর পুত্র রাহুলের একলা চলো নীতি ব্যর্থ হয়েছে চলতি বছরের প্রতিটি নির্বাচনে। রাহুলকে নির্বাচনী যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি করে কংগ্রেস সর্বত্র জনসমর্থন হারিয়েছে। সোনিয়া গান্ধীকেও দেশের মানুষ জননেত্রী হিসেবে মানতে চাইছে না। মাতা-পুত্রের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। জাতীয় কংগ্রেসের হাল ধরার মতো নেতা কেউই নেই। পশ্চিমবঙ্গে মৃতপ্রায় কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে তোলার যত চেষ্টাই তৃণমূল নেত্রী করুন না কেন তাতে লাভের চেয়ে লোকসানটাই বেশি। সিপিএম দলেরও এখন রাহুর দশা চলছে। বিমান-বুদ্ধ-গৌতম দেবদের সঙ্গে তাঁদের দলেরই ৯০ শতাংশ নেতা কর্মীরা নেই। জেলায় দলের ছন্নছাড়া অবস্থা। বামপন্থীদের সঙ্গে কোনোরকম নির্বাচনী সমঝোতা করলে বাংলার রাজনীতি সচেতন মানুষ তা মেনে নেবেন না। তৃণমূল নেত্রীর মনের কথা বোঝা দুঃসাধ্য। একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে নেত্রী তাঁর ফেসবুকে কংগ্রেস এবং সিপিএম সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করছেন না। তাঁর যাবতীয় সমালোচনা বিজেপির বিরুদ্ধে। বোঝাই যায় যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি—তৃণমূলের সরাসরি লড়াই হবে। মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটদাতারা বিজেপি ও শিবসেনা প্রার্থীদেরই ভোট দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই দুই রাজ্যের ভোটকে 'হিন্দুত্ব' আদর্শের প্রতি সমর্থন বলে মনে করছি। কারণ, দু'টি দলই হিন্দুত্বর প্রতি আস্থাশীল।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা ভাল যে ভারতের মুসলমানরা সকলেই হিন্দু বিরোধী নন। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে বহিরাগত মুসলমান

গূঢ়পুরুষের কলম

অনুপ্রবেশকারীরাই ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত। ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায় শান্তিতেই বাস করতে চান। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মগজ ধোলাই করে বিদেশী মুসলমানরা দেশে অশান্তি ছড়াতে চাইছে। চলতি বছরে ভারতের মাটিতে যতগুলি নাশকতামূলক ঘটনা ঘটেছে তার পিছনে এইসব অনুপ্রবেশকারী জেহাদি মুসলমানদের হাত আছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ-র তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে জামাতের জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গে বড়সড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ষড়যন্ত্র করেছিল। ঘটনাচক্রে খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডটি ঘটায় সাময়িকভাবে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।

তৃণমূল নেত্রী গোঁসা করেছেন কেন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে খাগড়াগড়কাণ্ডের তদন্তভার প্রধানমন্ত্রী এন আই এ-কে দিয়েছেন। এইসব কথা বলে নেত্রী বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ রাজ্যের সাধারণ আইন শৃঙ্খলার বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক বিষয়। এই ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশের জামাত জড়িত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। জানা গেছে বিপুল সংখ্যায় জামাত জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে অনুপ্রবেশ করেছে। এদের উদ্দেশ্য, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে শরিয়ত রাজের প্রতিষ্ঠা করা। এরা সকলেই গোঁড়া সুন্নি মুসলমান। ১৯৯৮ সালে ঢাকার কাছে পালামপুরে আবদুর রহমান নামে জনৈক মৌলবাদী জামাতের প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশের তৎকালীন শাসকদল বি এন পি এবং তার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন জামাতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ এবং দলের নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জামাতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয়েছে। জামাতের চারজন প্রধান নেতাকে বিচারের পর ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। বাংলাদেশে জামাতের প্রধান ঘাঁটি ছিল রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রামে। ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করার ফলে জামাতের প্রায় লক্ষাধিক সক্রিয় জেহাদি পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে আশ্রয় নিয়েছে। পূর্ব ভারত এইসব অনুপ্রবেশকারী জেহাদিদের কাছে সফ্ট টার্গেট। অসমে কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের জনসমর্থন যত কমছে ততই এই দু'টি দল বহিরাগতদের সন্ত্রাসকে আশ্রয় করে ভোটে জিততে চাইছে! বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল চায় না। একদা সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিরোধী ছিলেন। কারণটা একই। সিপিএমের সমর্থনে ভাটার টান রুখতে বুদ্ধদেববাবুরাও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের উপর নির্ভর করেছিলেন। আজ যেমন তৃণমূল নেত্রী করছেন। বামপন্থীরা ক্ষমতা থেকে হঠেছেন। কিন্তু তাতে রাজনীতির পরিবর্তন হয়নি। কারণ, সিপিএমের চেনা পথেই তৃণমূলের রাজনীতি চলছে চলবে। ■

কাকেরা ঘেরাও করবে সিবিআই অফিস

মাননীয় শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
সারদাখ্যাত চিত্রশিল্পী
কলকাতা
মাননীয় শিল্পী,

আপনার ঠিকানায় সারদা-খ্যাত লেখার জন্য ক্ষমা করবেন প্লিজ। আসলে আপনি যে স্তরের শিল্পী তা সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আপনি ভালোই জানেন যে চিত্রশিল্পের কদর সাধারণে জানে না। এটা মুষ্টিমেয় চিত্রমোদীর ব্যাপার। তাঁরাই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ছবি কেনেন। ছবির রস বোঝেন। ছবি ঘরে ঝুলিয়ে রাখেন। অনেকে ছবিতে বিনিয়োগও করেন। পরবর্তীকালে এই ছবির দাম কয়েকশো গুণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও যে থাকে। আবার ভবিষ্যতে ছবির দাম কমে যাবে নিশ্চিত জেনেও অনেকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে ছবি কেনেন। কেন কেনেন জানি না। এমনকী ছবি কিনছেন না জেনেও তাঁরা ছবি কিনে ফেলেন। সুদীপ্ত সেনের মতো ছবি-রসিক এই ভূ-ভারতেই নেই। অনেকে বলেন গোটা বিশ্বেও নেই।

এই রে, আসল কথাটাই বলা হলো না। যেটা বলছিলাম আরকি। আপনার ছবির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই তাঁরা এতদিন আপনাকে চিনতেন ওই একটা দাড়িওয়ালা লোক টিভিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুখ্যাতি করেন। নিশ্চয়ই কেউকেটা কেউ হবেন। কারণ, তাঁকে এই রাজ্যের দিদিও 'দাদা' বলে ডাকেন। শুভাদা, শুভাদা বলতে দিদি একেবারে অস্থির। কিন্তু এবার সবাই আপনাকে চিনে গেছে। সবাই বলছে হ্যাঁ, হ্যাঁ শুভাপ্রসন্নকে চিনি তো। লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি পরে সিবিআই অফিস থেকে ভিজে চোখে রোজ রোজ বের হন যে সেই তো। সেকারণেই এটা কোন শুভাপ্রসন্নকে চিঠি তা স্পষ্ট করতে 'সারদা-খ্যাত চিত্রশিল্পী' পরিচয়টাই আমার মনে হলো ঠিকঠাক।

তবে দাদা আমি জানি আপনি কত উঁচু দরের শিল্পী। জানি আপনার কাক ভুবনবিখ্যাত। অ্যান্টানায় বসে কা কা করা কাক আপনার তুলির ছোঁয়ায় ধনীর বৈঠকখানার ইজ্জত বাড়ায়। আপনার বাড়ির ঠিকানা সব কাকে জানে। অথচ অসভ্য মিডিয়া ইদানীং একদম আপনার কদর করছে না। কদিন আগেও অবশ্য একটা বাইট পাওয়ার জন্য ল্যা ল্যা করত। আপনার অতসুন্দর ঋষি ঋষি দাড়ি, মিষ্টি নির্মল হাসি তবু আপনাকে যেন ভিলেন ঠাউরেছে। আপনার বিপদ দেখে সব যেন খ্যা খ্যা করে হাসছে। এসব দেখে না দাদা রাগে আমার রক্ত মাথায় উঠে যায়।

সারাদিন ছবি এঁকে, দিদিমণিকে আঁকা শিখিয়ে, সতেরটা উদ্বোধন করে সরকারি সাঁইত্রিশটা কমিটির মাথা হয়েও আপনি যেরকম ফিটফাট থাকতে পারেন সেটার কেউ কদর করল না। এই পোড়া দেশটার বিশেষ করে বাঙালির কিস্যু হবে না। বিদেশ হলে আপনার জীবিত অবস্থাতেই রাস্তায় রাস্তায় মূর্তি বসে যেত। এই যে একজন শিল্পীকে সিবিআই তদন্তের নামে হেনস্থা করছে দিনের পর দিন, উলটো পালটা প্রশ্ন করছে তার কোনো প্রতিবাদ নেই দাদা। আমার এই চিঠি আর কতটুকু পারে বলুন? সরকারি জমিতে আর্ট গ্যালারি করে আপনি পয়সা কামাচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু বাঙালির শিল্পী সত্তাকে যে গ্যালারি বন্দি করলেন তার জন্য এই জাতটার তো আপনাকে পুজো করা উচিত। কিন্তু তা না করে এখন একের পর এক বেয়াড়া প্রশ্ন করে চলেছে। সুদীপ্ত সেনের থেকে আপনি কত টাকা পেয়েছেন? ৬ লক্ষ না ১৪ লক্ষ টাকা—প্রশ্ন করে আপনাকে পাগল করে দেওয়ার জোগাড়। আরে বাবা, আপনি একজন শিল্পী। এত সব টাকার হিসেব মনে রাখা কি আপনার কাজ নাকি! আপনার কাজ তো সৃষ্টি করা।

সেই সৃষ্টির তাগিদেই তো একটা চ্যানেল করতে গিয়েছিলেন। দিদির কৃপায় দেবকৃপা নামে কোম্পানি গড়েছিলেন। তারপর একটা লোক প্রণাম ট্রনাম করে চ্যানেলটা কিনতে চাইল। বেচে দিলেন। এর বেশি তো কিছু করেননি। তাতেই গেল গেল রব উঠেছে। আরে বাবা, একজন শিল্পী পয়সা পেলে তো আনন্দ হওয়া উচিত। কত শিল্পী না খেতে পেয়ে মারা গেছে তার খোঁজ কেউ রেখেছে। আর একজন শিল্পী একটু দু'নম্বরি করেছে বলেই তাঁকে শকুনের মতো ঠোকরাতে হবে?

দিদির ছবি কত টাকা বিক্রি হয়েছিল সেই অবান্তর প্রশ্নও আপনাকে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ছবির কি সত্যিই ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা দাম হতে পারে! এরা বোঝে না শিল্পের দাম হচ্ছে আপেক্ষিক। আপনার কাছে যা খোলামকুচি সেটাই আর একজনের কাছে লিয়োনার্দো দ্য ভিঞ্চি। কে বলতে পারে মঙ্গলগ্রহে প্রাণের খোঁজ মিললে সেখান থেকে দিদির কাছে এর থেকেও বেশি দামের ছবি কেনার অফার আসবে না? আজ থেকে তিন চারটে শতাব্দী পর দিদির হিজিবিজির দাম হয়তো কোহিনুরের সমান হবে।

যাকগে দাদা, আপনি হতাশ হবেন না। ভেঙে পড়বেন না। প্রতিবাদ হবেই। আমার বাড়ির ছাদে আজ একটা মিটিং হয়েছে। আমি আড়ি পেতে সব শুনেছি। কাকেরা ঠিক করেছে সিবিআই অফিস ঘেরাও করবে। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিকেও স্মারকলিপি দিতে পারে। দিনটাই শুধু পাকা হয়নি। জানতে পারলেই আমি জানিয়ে দেব।

— সুন্দর মৌলিক

বঙ্গে শিল্পসঙ্কট : জমি-নীতি নয়, সমস্যা অন্যত্র

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

যত বদনাম দেওয়া হোক না কেন বাঙালি ব্যবসাবিমুখ, শিল্প বিমুখ বলে, এর পেছনে ঐতিহাসিক সত্যতাও রয়েছে। সুজলা- সুফলা বাংলার মাটিকে শস্যশ্যামলা করতে বেশি খাটতে হয় না। সে কারণে কৃষিই যে বাঙালির প্রধান জীবিকা হবে এতে অন্যায় কিছু নেই। ঝুঁকিবহুল ব্যবসা-বাণিজ্য তার কর্মসংস্কৃতিতে বিশেষ একটা ঠাঁই পায়নি। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা বাড়ার কারণে কৃষিনির্ভর আয় দিয়ে সবলোকের পেট চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে সে ধীরে ধীরে শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সাম্প্রতিককালে খেতমজুরের একটা বিরাট অংশ জীবিকার টানে শিল্পোন্নত রাজ্যগুলিতে পাড়ি জমিয়েছে। বামজামানার শেষ দিকে সরকারেরও বোধদয় হয়েছিল যে শিল্প ভিন্ন আর অন্য কোনো পথ নেই।

বামফ্রন্টের বাংলায় ক্ষমতা দখলের সময়টাতে 'লাইসেন্স রাজের' রমরমা ছিল। সেই যুগে কোষাগারের টাকায় রাজনৈতিক স্বার্থেই তারা সরকারি লগ্নিকে বেশি পছন্দ করেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে তাঁর বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন, বৃহৎ বেসরকারি শিল্প তাঁদের কাছে একেবারেই ব্রাত্য ছিল। 'লালফিতের ফাঁসে' এ রাজ্যে শিল্পপতিদের দমবন্ধ করা পরিস্থিতি ছিল। প্রকল্পকে প্রস্তাব থেকে রূপায়ণ পর্যন্ত নিয়ে যেতে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হোত। শিল্প নিয়ে সরকারি দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। কারখানার মতো শিল্প প্রস্তাবগুলির ছাড়পত্র জোগাড় করতে শিল্পপতিদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হোত। তেমনি অন্যদিকে শ্রমিক স্বার্থে (?) কলকারখানায় চলতো জঙ্গি আন্দোলন। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না— এই যুক্তিতে লগ্নিপতিরা ভিনরাজ্যমুখী হতে শুরু করল। এমনিতেই শিল্পের গন্তব্য হিসেবে কোনো কারণেই পশ্চিমবঙ্গ স্বর্গরাজ্য ছিল না। বড় বা ভারী শিল্পের উপাদান বা প্রাকৃতিক সম্পদ সেই অর্থে পশ্চিমবঙ্গে নেই। এ ব্যাপারে কার্যকরী অনুসন্ধান করার সরকারি প্রচেষ্টা বাংলার মানুষ কোনো কালে দেখেনি। প্রচুর জনসংখ্যা মানেই যে বিপুল বাজার নয়, সার্বিক ক্রয়ক্ষমতা যে বাজারের আসল শক্তি সে সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা লগ্নিকারিদের আছে। তাই সরকারি থেকে বেসরকারি উদ্যোগ ধীরে ধীরে এরাজ্য থেকে তাদের ব্যবসা গোটাতে শুরু করে। বাম সরকার যে শিল্প বিরোধী নয়, লগ্নিপতিদের একথা বোঝাতে শেষ কয়েক বছরে বামশাসককুলের কালঘাম ছুটে গেছে। ততদিনে শিল্প নিয়ে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটা 'নন্দলালের' মতো হয়ে গেছে।

প্রায় সাড়ে তিন দশক পর শিল্পপতিদের অস্বস্তি কয়েকগুণ বাড়িয়ে জমি আন্দোলনের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন এল। সরাসরি শিল্পবিরোধী না হলেও বাংলা যে শিল্পের পৃষ্ঠপোষক নয় সেকথা আরোও একবার প্রমাণিত হলো। দীর্ঘ টালবাহানার পর সরকারের দু-বছর পূর্তির মুখে শিল্পনীতির রূপরেখা হাতে পেয়ে শিল্পপতিরা বিশেষ একটা আশার আলো দেখেনি। তাঁদের মতে, বড় শিল্পের জমি মিলবে কোথা থেকে, তার সদুত্তর শিল্পনীতিতে নেই। বেসরকারি এবং যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পের জন্য সরকার জমি নেবে না; তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পকেও বিশেষ আর্থিক অঞ্চল ঘোষণা করার দাবি যে মানা হবে না— এ বার্তা সরকার তার শিল্পনীতি থেকে শিল্প সম্মেলন, সর্বত্র পৌঁছে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "গ্রামীণ হাট, গ্রামীণ শিল্পকে উৎসাহ দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য"। শিল্পমহলের মতে, ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু বড় শিল্প ছাড়া কোনো রাজ্যের অগ্রগতি সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে গুরগাঁও ও চেন্নাই-এর গাড়ি শিল্পের প্রসঙ্গ টেনেছেন তাঁরা। গাড়ি শিল্পের দৌলতেই সেখানে ছোট আর মাঝারি শিল্পের বাড়বাড়ন্ত বলে তাঁদের দাবি।

পুরনো শিল্পসম্পর্কে সরকারের মনোভাবও এরাজ্যে লগ্নিপতিদের গভীর সংশয়ের কারণ। শিল্পে কারণে-অকারণে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট এরাজ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে

মমতাদেবী কাগজের ফুল, মাটির পাখি, মেলা, নাচ-গান-নাট্যচর্চা ইত্যাদিকে নির্দ্বিধায় শিল্পের তালিকাভুক্ত করে চলেছেন। সম্প্রতি গায়ক-নায়ক সম্বলিত বিরাট দল নিয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে শিল্পপতিদের 'বাংলা চলো' যাত্রাগান পরিবেশন করলেও তাঁরা কিন্তু বলছেন গুজরাট যাবেন।

বিবেচিত হয়ে এসেছে। সরকারের মদতে কারখানার গেটে 'লাল পতাকার' দাপাদাপি এ রাজ্যে একটি অত্যন্ত চেনা ছবি ছিল, যার পরম্পরা 'পরিবর্তনের সরকারের' আমলেও অটুট থেকেছে। শুধুমাত্র জঙ্গি আন্দোলনের জেরে প্রায় প্রতিদিন এক এক করে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়েছে। সময়ে সময়ে 'সিন্ডিকেট' চক্রকে চাঁদা দেওয়া বা তাদের পছন্দের লোককে কাজে নেবার মালিকপক্ষকে এতটাই আতঙ্কিত করেছে যে গত তিন বছরে শ্রমদপ্তরের (সরকারি) হিসেব অনুযায়ী শতাধিক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে মনে হতে পারে যে জমিনীতি আর শ্রমিক অসন্তোষই এ রাজ্যে শিল্পের পথে অন্যতম বাধা। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এর কোনোটাই আসল কারণ নয়। মূল সমস্যা অন্যত্র— শিল্প সম্পর্কে সরকারের অবস্থান। আর এগুলো হলো তারই অনুসারি বাহ্যিক উপসর্গ মাত্র! কি রকম? শিল্প করতে হবে না একথা যে সরকার বোঝে না তা কিন্তু একেবারেই নয়। এও ধ্রুবসত্য যে, শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। এ রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে গবেষণা বলছে যে, সঠিকভাবে শিল্প করতে কৃষিজমির মাত্র এক শতাংশ অধিগ্রহণ করলেই চলবে। তাতে কৃষি উৎপাদনে বিশেষ একটা হেরফের হবে না। অন্যদিকে শিল্প যে নিজের জমি কিনে কারখানা করতে রাজি নয় বা জমির মালিক তার জমি বিক্রি করতে অনিচ্ছুক তাও বলা যাবে না। এ রাজ্যে অনেক সংস্থা (উদাহরণ : জিন্দল) নিজের জমির সংস্থান নিজেই করেছে। আসলে সঙ্কীর্ণ রাজ্য- রাজনীতির কারণেই বাংলায় শিল্পের সম্ভাবনাকে বলি দেওয়া হয়েছে। 'বাঙালিচরিত' নামে যদি এ রাজ্যে কোনো প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়, তার প্রথম পুরস্কার পাবে বামপন্থীরাই! ঝুঁকিহীন জীবনযাপনের যে 'জিন' বাঙালি বংশপরম্পরায় বহন করে চলেছে, সে নিয়ে বামেরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। কৃষিজমি রক্ষার নামে আন্দোলন বাঙালির বেশ পছন্দের বিষয়। 'লালপতাকা' উড়িয়ে শিল্প বিতাড়নের মধ্যে তাঁরা একরকম স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বাদ পেতেন। বামেরা বরাবর মুখে বলেন তাঁরা মেহনতি মানুষের পক্ষে। এটা কিন্তু তাঁদের অন্তরের ভাষা নয়। জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন কখনোই শ্রমিক স্বার্থে হতে পারে না। এর পেছনে ছিল বামপন্থীদের গভীর চক্রান্ত। বাম-রাজনীতির মূলধন হলো মেহনতি মানুষগুলোকে প্রান্তিক শ্রমিকে পরিণত করা। গরিবরা যতদিন আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ও অজ্ঞ থাকবে ততদিন তারা 'লাল পতাকার' কাছে অনুগত থাকবে। এতে যেমন এসব মানুষের মন পাওয়া যাবে, তেমনি সরকারকেও শিল্পায়ন আর উন্নয়নের গুরুভার বইতে হবে না। তেলমেখে স্নান করে ভরপেট খেয়ে দিবানিদ্রা আর সন্ধ্যায় আন্দোলনের শ্লোগানের গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তো দিব্যি তিন দশক আরামে কাটানো গেল! ক্ষমতায়নের কী অসাধারণ সরল সমীকরণ! এই তত্ত্ব কিন্তু পরিবর্তনের কান্ডারি মমতা দেবীর বেশ মনে ধরেছিল। মমতা প্রসঙ্গ এলেই রাজ্যের এক বরিষ্ঠ বিরোধী নেতা চোখ বুঁজে ভাঙ্গা রেকর্ড চালিয়ে দেন— 'আমি তো বলেইছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী'।

কথাটা আংশিক সত্য। সামান্য সংশোধন করে যদি কথাটা হোত— মমতা সিপিএমের পাঠ মুখস্থ করেন আর তার বাস্তবে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই একটি বিষয় তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। পাঠ্যবইটি যখন লেখা হয় তখন আমাদের দেশে তথ্য-প্রযুক্তি আজকের মতো উন্নত হয়নি। কৃষি বা শিল্পনীতি নিয়ে বাদবাকি রাজ্য সরকারগুলি কি অবস্থান তা আজ সহজেই জানা যায়। একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পায়নের বিকল্প কিন্তু কৃষি নয়।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা— সব জেনে বুঝেও যে হাত-পা বাঁধা। জমিনীতির পরিবর্তন মানেই এ সরকারের কাছে আত্মহনন! জঙ্গি জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই তৃণমূলের আত্মপ্রকাশ। টাটার মতো শিল্পপতির হেনস্তা দেখার পরও টাকা ঢেলে আবার এ রাজ্যে শিল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো পাগল শিল্পপতি দেশে-বিদেশে আছে কি? কিন্তু এসব নিয়ে ভাবলে চলবে, সরকারের চলবে না। লোকজনকে বোকা বানানোর নিরন্তর খেলা যে চালিয়ে যেতে হবে। তাই মমতাদেবী কাগজের ফুল, মাটির পাখি, মেলা, নাচ-গান-নাট্যচর্চা ইত্যাদিকে নির্দ্বিধায় শিল্পের তালিকাভুক্ত করে চলেছেন। সম্প্রতি গায়ক-নায়ক সম্বলিত বিরাট দল নিয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে শিল্পপতিদের 'বাংলা চলো' যাত্রাগান পরিবেশন করলেও তাঁরা কিন্তু বলছেন গুজরাট যাবেন। রাজ্যের একজন সফল রাজনীতিক শিল্প আনার এই প্রয়াসকে কটাক্ষ করেছেন— ''শিল্প আনা অত সহজ নয়। এভাবে বাংলায় শিল্পী আসতে পারে, শিল্প নয়।'' তবুও 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'— এ প্রবাদ মিথ্যে নয়। আজ গুজরাট বা তামিলনাড়ুর মতো পশ্চিমবঙ্গও যে শিল্পের গন্তব্য হতে পারে এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি করতে সরকারকে অনেকটা কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। কিন্তু শিল্পায়ন যে উদ্দেশ্য নয়, ক্ষমতা দখলের জন্য শিল্প নিয়ে ছেলেখেলাই যে আসল লক্ষ্য এই সত্যটা আজ বাঙালি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আরও বড় সত্য হলো যে বামেদের মতো তৃণমূলও যতদিন বাংলা শাসন করবে ততদিন এ বঙ্গে শিল্পায়ন কোনো মতেই সম্ভব নয়। একটু বড় করে দেখলে, এ রাজ্যে শুধু শিল্প নয়, প্রশাসনের সবক্ষেত্রে সম্প্রসারিত বাম সংস্কৃতির ধারা সমানভাবে বয়ে চলেছে, শুধু পতাকার রং পাল্টেছে মাত্র!

জমি আন্দোলনের নামে মাসাধিককাল ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করাতে মমতাদেবীকে বাম সরকারের বাধা না দেওয়া; একাধিকবার তাঁর জ্যোতিবাবুকে প্রণাম করতে যাওয়া; হুবহু বামকায়দায় প্রশাসনযন্ত্র দিয়ে বিরোধী শেকড় নির্মূল করার চেষ্টা; নবান্নে বুদ্ধ-বিমানবাবুদের চা-চক্রে ডেকে নিয়ে সংগঠন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া; বামেরা অচ্ছুত নয় মন্তব্য করে তাদের সঙ্গে জোট সম্ভাবনা জিইয়ে রাখা ইত্যাদি আরও অনেক ঘটনা পরম্পরার মধ্যে দিয়ে আপনারাও কি আমার মতো রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন? ■

পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদ্রাসা শিক্ষা

বিমল প্রামাণিক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার একটা বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ছে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আশির দশকেই ব্যাপক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে এবং ১৯৮১-৯১ দশকে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি এতই বেড়ে যায় যে ১৯৭১ সালের পর জনসংখ্যার এত বৃদ্ধির হার (৩৬.৮৯ শতাংশ) কেউ দেখেনি। এরই সঙ্গে গজিয়ে উঠতে থাকে প্রচুর বেসরকারি মাদ্রাসা, মসজিদ ও উগ্র ইসলামি মৌলবাদী কার্যকলাপ। অর্থাৎ অনুপ্রবেশের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা ও ধর্মান্ধ কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ যোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

মুসলমান সম্প্রদায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে। এবং বৃহত্তর সমাজে মুসলমান জনগোষ্ঠী মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেন্দ্র করে নিজেদের আলাদা একটা পরিচিতি দিতেও সবসময়ই সচেষ্ট থাকে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে শিশু বয়স থেকে ছাত্রদের এমনভাবে গড়ে তোলা যে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক-সামাজিকভাবে তাদের কট্টর মুসলমান তৈরি করা। পশ্চিমবঙ্গের মতো নানা ধর্ম-সংস্কৃতি-সম্প্রদায় অধ্যুষিত রাজ্যে এই ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা ছাত্রদের মন-মানসিকতার যে বিভেদমূলক চিন্তার জন্ম দেয়— তা যথেষ্টই ক্ষতিকর একথা না বলে পারা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার দাবি করতো যে সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা এখন অনেকটাই আধুনিক করা সম্ভব হয়েছে কয়েকটি অনাধ্যাত্মিক যুগোপযোগী বিষয় এই পঠন-পাঠনে যুক্ত করে। যেমন, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি। ১৯৮৭-৮৮ সালে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আলাদা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আনা হয়েছিল এবং সরকারি অনুদানও কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু ওই সময় সরকারি স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসার সংখ্যাও কম ছিল না। অন্যদিকে খারিজি/কওমি মাদ্রাসা যেখানে সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বা তারাও সাহায্যের প্রত্যাশা করে না, এর সংখ্যা হাই/ সিনিয়র/ জুনিয়র মাদ্রাসার প্রায় দশগুণের অধিক। এর কার্যক্রম, পঠন-পাঠন, তহবিল পরিচালনা ও উৎস এর কোনোটাই সরকারি নিয়মে চলে না। ওই সকল প্রাইভেট মাদ্রাসার সম্পর্কে সরকারের নিকট কোনো সঠিক তথ্যও নেই। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ঘোষণা করেন, 'আমরা দশ হাজার মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দেবো'। পরবর্তীকালে দেখা গেল দশটা মাদ্রাসাও স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এগিয়ে আসেনি। কেন প্রাইভেট মাদ্রাসা সরকারি স্বীকৃতি চায় না, সরকার কি তা ভেবে দেখেছে?

দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমান সমাজের গরিব এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকেই মূলত ছাত্র-ছাত্রী ওই সকল মাদ্রাসায় পড়তে আসে। গত সাড়ে তিন দশক ধরে বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ভাবে নানা প্রচেষ্টা চোখে পড়ছে। এমনকী সমাজে পিছিয়ে পড়া তপসিলি/ উপজাতি সম্প্রদায়ের গরিব অংশকেও মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ওই সব ছাত্র-ছাত্রীর মনন এবং চিন্তার উপর ইসলামি প্রভাব অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোকজনকে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের প্রতি টানার একটা কৌশল নয় কি?

মাদ্রাসা বা ধর্মশিক্ষা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান সমাজের গভীরে প্রেথিত। তবুও বর্তমানে ধর্মীয় শিক্ষাকে পিছনে ফেলে আধুনিক শিক্ষা মুসলমান সমাজে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু সরকারি ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি চলেছে, বিশেষ করে গরিব এবং নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারগুলির কল্যাণে! এটা শুধু কম খরচের শিক্ষা ব্যবস্থাই নয়, বহু মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানেই উগ্র ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ক্যাডার ও জেহাদি তৈরি করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বেসরকারি মাদ্রাসাগুলিতে আরবি ভাষা ও ইসলামি ধর্মতত্ত্ব বা কোরান / হাদিসকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়, আর এগুলির নিয়ন্ত্রণ থাকে মৌলবাদী মৌলবি / ইমামদের হাতে। মুসলমান সমাজে বরাবরই কোরান ধর্মীয় পুস্তক পাঠের একটা প্রবণতা রয়েছে। এছাড়া নামাজ পড়া, টুপি পরা, দাড়ি রাখা, বোরখা বা হেজাব পরা প্রভৃতি বাঙালি মুসলমান সমাজে কয়েক দশক ক্রমবর্ধমান। এটা যেন ইসলামের একটা প্রধান পরিচয়। বাংলাদেশ জন্মের পর এই ধরনের একটা অবান্তর ধারণা ও জেহাদি ঢং পশ্চিমবঙ্গে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভাবখানা এমনই যে পশ্চিমবঙ্গ যেন কোনো বিদেশী শাসকের অধীন। বাম শাসনামলে এ হেন সংস্কৃতির গভীরতা আরো স্পষ্ট হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা কখনও অনাধ্যাত্মিক বিষয়

ছিল না আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মতো। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরাও মতামত ব্যক্ত করেছেন এইভাবে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে সরাসরি সাহায্য করে। অথচ বামফ্রন্ট সরকার এর মধ্যে সিকিউলার বিষয় খুঁজে পেল! যারা সরকারি মাদ্রাসায় পড়তে আসে, সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীগণও চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বেসরকারি মাদ্রাসায় পড়ে আসে, যেখানে পাঠ্য বিষয় বা পরিচালনায় কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই, তারা প্রধানত আরবি ও ধর্মীয় বিষয় সমূহের মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। আর যারা সরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয় থেকে আসে তারা হাইস্কুলগুলিতে ভর্তি হয়। হয়ত দু' একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। ফলে, যারা সরকারি মাদ্রাসা থেকে পাশ করে যাচ্ছে তাদেরও চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কারমুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না, ধর্মীয় প্রভাব বলয়ের বাইরে বের হতে পারে না।

একটি যুগোপযোগী, কার্যকর ও আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যেই ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার এই সহাবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে— এমনটা দাবি করা হলেও, এই উদ্যোগের পিছনে প্রকৃতপক্ষে কোনো সদিচ্ছা ছিল কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ধর্মভিত্তিক এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার নৈতিক ও মানবিক চেতনা বিকাশের দিকটা উপেক্ষিতই রয়েছে। এতে অনেক সুবিধাবাদিতা, পশ্চাদমুখিনতা তথা প্রতিক্রিয়াশীলতার উপাদান রয়ে গেছে। এই নতুন কোর্স ভর্তির শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবে এক শ্রেণির মৌলবাদী বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি ও তাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে। এটা পরিষ্কার যে, মাদ্রাসা শিক্ষার এই পরিবর্তনের পিছনে সত্যিকারের সংস্কার মনোবৃত্তি বা আধুনিকতা ছিল না, বরং এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল বড়। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বাধিক ভূমিকা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার এই যে কৌশল, তার দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমত কিছু পেশা ও অপেক্ষাভিত্তিক link subjects মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার কিছুটা সমজাতীয়করণ এবং দ্বিতীয়ত, মাদ্রাসা শিক্ষাকে বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া ও স্বীকৃতি অর্জন। এদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রভাবকে একটি দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার লক্ষ্যেই একটি বিশাল মৌলবাদী ছাত্রসমাজ তৈরি করা যেন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে! বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার দ্রুততর বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে জামাত প্রভৃতি ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের প্রসার বিবেচনায় এনেই এদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন।

বর্ধমান বিস্ফোরণকাণ্ড ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা ও ইসলামি সন্ত্রাসী গোষ্ঠিগুলির যে পরিচয় এ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে, উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। সীমান্তের উভয়পাশেই এমন একটি জনগোষ্ঠীর বাস, যারা জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষাগত ভাবে একই। এর ফলে জঙ্গি সংগঠনগুলির জেহাদি ক্যাডার খুব সহজেই ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে ঘাঁটি তৈরি করতে পারছে। তদুপরি বর্তমান রাজনীতির ছত্রছায়ায় তো সোনায় সোহাগা। একথা মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় মুসলমানরা এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার বা মানবাধিকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেও কোনো মুসলমান প্রধান দেশের মুসলমানরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিষবৎ জ্ঞান করেন। এখনও ধর্মের বিধান নিয়ে রাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনার মতো মধ্যযুগীয় মৌলবাদী কর্মকাণ্ড আজও আমাদের দেখে যেতে হচ্ছে! এর বিরুদ্ধে ইউরোপ, আমেরিকার দেশগুলিতে জনমত ক্রমশ জোরদার হলেও ভারতে তেমনটা হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল এতদিন ভোটব্যাঙ্কের সুবিধাবাদী রাজনীতির মধ্যে নিজেদের ব্যাপৃত রাখলেও আজকে পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অন্তত দু'চারজন মুখ খুলতে বাধ্য হচ্ছে। বাঙালি কি সত্যিই আত্মঘাতী?

(লেখক ডিরেক্টর, সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেসনস্)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

ঘরের মধ্যে বিদেশী ও বোমা
পথেঘাটে কিন্তু তেমন কলরব নেই

মোহিত রায়

বিদেশীরা অনেকদিন ধরেই আসছে। পড়শী বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে হয়ে চলেছে। অথচ এ বাংলায় আমরা কিছুতেই তা নিয়ে বিন্দুমাত্র গা করিনি। বরং ওপার বাংলা-এপার বাংলা নিয়ে মাতামাতি করেছি। আমাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি ঘটনা ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়ে একেবারে বিষাদসিন্ধু কাব্য রচনা করি ফি বছর আর ওপারে প্রতি বছর দুর্গাপূজার আগে নিয়ম করে প্রতিমা ভাঙা হয়। ১৯৯০, ১৯৯২, ২০০১, ২০১৩-তে কখনো বাবরি ধাঁচা, কখনো নির্বাচন, কখনো শাহবাগ আন্দোলনের নামে শয়ে শয়ে মন্দির-দোকানপাট ভাঙা হয়, মেয়েরা ধর্ষিতা হন। আর সারা বছর ধরে বাংলাদেশে কোথাও না কোথাও নির্যাতন চলেই। আজকাল ইন্টারনেটের সৌজন্যে বাংলাদেশের কাগজেই এগুলি পড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনো ঢেউ ওঠে না। বাংলাদেশে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙা চলে— এপারে দুর্গাপূজা চলে প্রতিবাদহীন। বাংলার সবচেয়ে বড় কালীমন্দির রমনা কালীবাড়ি ভেঙে দিলেও এপারের কালীপূজায় তার কোনো ছাপ পড়ে না। এমনকী যেসব ধর্মগুরু ও প্রতিষ্ঠান পূর্বপাকিস্তান / বাংলাদেশ থেকে তাঁদের হেড অফিস তুলে পালিয়ে এপারে জমিয়ে বসেছেন তাঁরাও সবসময় দারুণ নীরব থাকেন।

প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছে। কি করে এত লোক এল? দায়িত্ব কার? প্রথমত, অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের। ভারতের সঙ্গে পশ্চিমে পাকিস্তানেরও সমতল দিয়েই দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। কিন্তু সেখান দিয়ে অনুপ্রবেশ সামান্যই। কারণ সরকার সেখানে সজাগ। অথচ পূর্ব সীমান্তে সেরকম তাগিদ একদম নেই। এই সীমান্ত দিয়ে রোজ পাচার হয় কোটি কোটি টাকার গোরু যা বাংলাদেশে জবাই করা হয়। আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে উৎকোচের বিনিময়ে তারাও এতে যুক্ত। কেন্দ্রে মূলত গত চল্লিশ বছর ধরে শাসন করেছে কংগ্রেস ও সেকুলাররা— তাদের দায়িত্বও সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যদি পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা এর প্রতিবাদ করতেন তাহলে এত অনুপ্রবেশ সম্ভব হোত না। এই প্রতিবাদহীন পশ্চিমবঙ্গে তাই ধর্মীয় জনমানচিত্র পুরো পাল্টে গেছে। ১৯৫১-তে ১৯ শতাংশ মুসলমান এখন পশ্চিবঙ্গে ৩০ শতাংশ-এ পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর ৩০ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত কোনো দেশই আর পরে নিজের ধর্মীয় স্বাধীনতা রাখতে পারেনি। বসনিয়া-হারজেগোভেনিয়া দেশটির জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ মুসলমান, কিন্তু তারা এটিকে একটি ইসলামি দেশে পরিবর্তন করেছে। নাইজেরিয়া ৫০ শতাংশ মুসলমানের দেশে চলেছে ইসলামি বোকো হারাম জেহাদিদের তাণ্ডব। আর ৬০ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা নিয়ে একেবারে পুরোপুরি ইসলামি দেশ হয়েছে মালয়েশিয়া। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের এখন দিন গুনবার পালা।

এই ১ কোটি অনুপ্রবেশকারী বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গের দেশ-বিদেশ খ্যাত অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, সমাজবিদরা এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যাঁরা এসব নিয়ে ন্যূনতম কিছু চর্চা করেন তাঁদের সাম্প্রদায়িক বলে শিক্ষার জগতে একঘরে করে রাখবার কাজে দারুণ সফল। এই ১ কোটি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য প্রয়োজন হয়েছে হাজার হাজার খারিজি মাদ্রাসার যেখানে তারা ধর্মশিক্ষা করে তাদের বিদেশী সংস্কৃতিকে টগবগে রাখবে। কলকাতা শহরের ২০০১-এর ধর্মীয় জনগণনায় (২০১১-র তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি, এমনকী নতুন সরকার আসবার পরেও না!) দেখা গিয়েছে শহরে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। কি করে তা হলো? এর কারণ? বাংলাদেশ থেকে বিহারী পাকিস্তানি মুসলমানরা এসে অস্তানা গেড়েছে কলকাতায় খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজে। এখন অনেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ছড়িয়ে গেছে। এই অনুপ্রবেশকারীরা দেশদ্রোহী হবেই। (আসন্ন কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে এই প্রসঙ্গটি কেউ তুলবেন?) গত কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গে কত জমি এই অনুপ্রবেশকারীরা কিনেছেন তার কোনো হিসাব কোথাও নেই। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জমির অনেকটাই এখন বিদেশীদের হতে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিও এখন অনুপ্রবেশকারীরা চালাচ্ছেন। অমুক মসজিদের ইমাম, অমুক শরীফের ইমামরা হয়ে উঠেছেন পশ্চিমবঙ্গের নীতি নির্ধারক। বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে তাড়ালো যারা তারা এই অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে। পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদীদের বড় শক্তি এই অনুপ্রবেশকারীদের শক্তি। এদের মাধ্যম দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ইসলামি মৌলবাদীদের সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলামি মৌলবাদীদের যোগাযোগ। ভারতের বন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জামাতের ভারত বিরোধিতাকে সাহায্য করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা জল বণ্টন চুক্তির বিরোধিতা করে তা বানচাল করলেন। এটা যে স্রেফ জামাতকে সাহায্য করবার জন্যই করা তা বোঝা গেল যে আজ পর্যন্ত মমতা তিস্তা সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব রিপোর্ট পেশ করলেন না।

নিষিদ্ধ দেশদ্রোহী ইসলামি সংগঠন সিমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশের জামাতপন্থী সংবাদপত্র নয়া দিগন্ত-র কলকাতা প্রতিনিধি আহমেদ হাসান ইমরান। তাঁর একটি অপরিচিত ইসলামি সাময়িকী কলম-কে সারদা গোষ্ঠীর টাকা ঢেলে তাকে দৈনিকে পরিণত করা হলো তৃণমূল কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায়। সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রেরিত নোট থেকে জানা যাচ্ছে যে ২০১৩-তে পার্কসার্কাস অঞ্চল থেকে লোক পাঠিয়ে ক্যানিংয়ের নলিয়াখালিতে ৩০০ হিন্দু বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবার ঘটনার পরিকল্পনা করেন এই হাসান ইমরান। কলম কাগজে এই হাসান ইমরানকে রোজ ভালো মানুষের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইমাম বরকতি সাহেব, আরেক ইমাম ত্বহা সিদ্দিকি ইত্যাদিরা। যে ইমামদের আমরা আমাদের পকেটের পয়সা থেকে এখন ভাতা দিচ্ছি— ১৪ মার্চ, ২০১৩-তে তাঁরা বর্ধমান শহরের

গোলাপবাগ মোড়ে জনসভা করে বাংলাদেশের জামায়েতের নেতা কুখ্যাত দেলোয়ার হোসেন সাইদীর মুক্তি দাবি করে। অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে একদল ধর্মীয় নেতা পশ্চিমবঙ্গে সদাই তৎপর।

চাই কলরব

এতদিন না দেখেও চলছিল যেন পাড়ায় পাশের বাড়িতে কারা থাকে, কি করে— তা নিয়ে আর মাথা ঘামান কেন? পাশের বাড়ি কে এল, কে পাড়ার জমি কিনে নিল— এসব জেনেও আমরা না জানার ভান করেছি। এভাবেই ঘরে ঢুকে গেছে অনুপ্রবেশকারীরা, জমি কিনে মাদ্রাসা করছে। কিন্তু এবার পাশের বাড়িতে বোমা ফাটছে, অস্ত্রাগার তৈরি হচ্ছে। একেবারে গান্ধী জয়ন্তীর দিনে তা ফেটে আমাদের ব্যঙ্গ করছে। এবার সবাই স্বীকার করছেন এই বোমাবাজরা এসেছে বাংলাদেশ থেকে কিন্তু এদের ভারতের ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট সব আছে, এখানে জমি-বাড়ি সব আছে। অনুপ্রবেশকারীরা প্রথমে এসেছিল খালি হাতে। জনশক্তি সঞ্চয় করে এবার বোমা বন্দুক জড়ো করছে আমার আপনার বাড়ির পাশেই বর্ধমানে, মেদিনীপুরে, কলকাতায়। কি করবেন?

যা করবার তা আমাদেরই করতে হবে, কেন্দ্র বা অন্যদের ভরসায় থাকলে চলবে না। এবার সরাসরি দেশের শত্রু কারা তা বলতে হবে আর বলতে হবে তাঁদের কথাও যাঁরা নীরব থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন না। আমরা জানি ও বলি বামপন্থী ও সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের কথা যাঁরা এই দেশদ্রোহী অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে কথা বলেন, এ নিয়ে আলোচনা করতে বাধা দেন। কিন্তু এই অনুপ্রবেশকারীরা যে ধর্ম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে দিয়েছে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতির গুরুদেবরা কোথায় লুকিয়ে বসে আছেন? তাঁরা কি পথে নামতে পারেন না? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসাধারণের অধিকাংশ কোনো না কোনো গুরুদেব বা তাঁদের ধর্মীয় সংগঠনের ভক্ত বা শিষ্য। পশ্চিমবঙ্গে যখন জেহাদি বোমা ফাটছে, মাদ্রাসা শিক্ষার বোরখায় সমাজকে ঢাকার চেষ্টা চলছে, তসলিমা নাসরিনকে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না, দেগঙ্গা-ক্যানিংয়ে হিন্দু বাড়ি-দোকানপাট জ্বলছে, সরকার ইমামদের ভাতা দিচ্ছে— তখন পশ্চিমবঙ্গের গুরুদেবরা, মিশন, সেবাশ্রম ইত্যাদিরা কোথায়? তাঁরা তাঁদের ভক্তদের কি করতে বলছেন? সমাজকে কি করতে বলছেন? যদি তাঁরা নীরব থেকে শুধু পরকালের জন্য জ্ঞানদান ও নিজেদের প্রতিষ্ঠানের সরকারি গ্র্যান্টের যোগাড়ে ব্যস্ত থাকেন তবে পশ্চিম-বঙ্গের ভবিষ্যৎ জেহাদিরাই ঠিক করবে। যদি পথেঘাটে নেমে কলরব না হয়, শুধু সংবাদপত্র আর টিভিতে বিবৃতিতেই থেমে থাকি তবে আবার উদ্বাস্তু হবার জন্য তৈরি হওয়াই ভালো।

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | JINDAL — AN ISO 9002 COMPANY, JINDAL ALUMINIUM LIMITED | NALCO — Aluminium Sheet Coil | ALOM — Aluminium Extruded Section

503, Kamalalaya Centre, 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA
Office : 3040 8706 / 07, Aluminium Div. : 3040 8731 / 32 / 33 / 34, 2215 5333
Hardware Div. : 3040 8727/28/29, 2215 9290. Fax : +91-33-2215 0455, 3040 8730
E-mail : info@alloyindia.com Website : www.alloyindia.com

With Best
Compliments From :

UP AND UP TRADERS PRIVATE LIMITED

চিঠিপত্র

বিচার বিভাগের মৌলিক সমস্যা

বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং বর্তমানে প্রেস কাউন্সিলের অধ্যক্ষ মার্কেণ্ডেয় কাটজু সমস্ত ঘটনার কথা জনসমক্ষে আনার পর বিচার বিভাগের আলমারি থেকে যে কঙ্কালটি বেরিয়েছে তার ফলে সামগ্রিক ভাবে বিচার বিভাগের সততা এবং নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা অবশ্যই নিম্নগামী হবে। সরকার এখন সংবিধানের ১২৪ (২) (সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ পদ্ধতি) এবং ২১৭ (১) ধারা (হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ পদ্ধতি) সংশোধন করে বিচার বিভাগের বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন করতে চাইছেন।

বর্তমানে বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্য রচিত যে বিলটি (Judicial Standards and Accountability Bill, 2012) ২০১২ সাল থেকে ঠাণ্ডা ঘরে পড়ে আছে সেটি পাশ হলেও আইনবিশারদরা মনে করেন পথভ্রষ্ট এবং দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকদের আইনে উল্লিখিত বিভিন্ন রক্ষাকবচের সহায়তা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন। বিশেষত এই ব্যাপারে কোনো মামলা মোকদ্দমা হলে ১৯৯৩ এবং ১৯৯৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া দুটি রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আবার আইনটির সাংবিধানিক বৈধতাই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে।

সরকার যদি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের জজসাহেবদের নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন করতে চান তাহলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। বিচার বিভাগের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সরকারকে অবিলম্বে সচেষ্ট হতে হবে। সাধারণ মানুষ অন্যায়ের শিকার হয়েও আজ আদালতের দ্বারস্থ হতে ভয় পান। তার কারণ মানুষের ধারণা যে একবার আদালতে গেলে কত টাকা খরচ হবে এবং কতদিনে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। দীর্ঘদিন আদালতে মামলা চললে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। অনাবশ্যক বিলম্ব এড়াবার জন্য বিভিন্ন স্তরে বিচার ব্যবস্থার সরলীকরণ আশু প্রয়োজন। বিভিন্ন আদালতে বহুসংখ্যক বিচারকের শূন্য পদগুলি যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে পূরণ করা প্রয়োজন। বিচারকদের নিয়োগপদ্ধতি হবে স্বচ্ছ। জনসাধারণের আস্থা অর্জনের জন্য বিচার বিভাগের সর্বস্তরে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মী, আধিকারিক (এর মধ্যে আইনব্যবসায়ীরাও পড়েন) এবং বিচারকদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন আদালতে যে লক্ষাধিক মামলা জমে আছে সেগুলির শুনানি শেষ করে রায়দান চূড়ান্ত করার জন্য সর্বস্তরে বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সর্বোপরি আদালতগুলিতে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ, পূজা, দেওয়ালি, খ্রীসমাস ইত্যাদি অবকাশ বাতিল করতে হবে। বিচার বিভাগেও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের মতই ছুটির ব্যবস্থা থাকবে। বিচার বিভাগকে তাদের স্বচ্ছতা, দ্রুততা এবং কর্মতৎপরতার দ্বারা জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে হবে।

এই সংস্কারপদ্ধতি শেষ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে কেবলমাত্র উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে নিছক প্রসাধনী পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকব।

এ সবই হয়ত ইংরেজিতে যাকে বলে utopian dreams। কিন্তু স্বপ্ন দেখেই তো মানুষ বেঁচে থাকে।

—সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়,
কাশীপুর, কলকাতা-১০২।

গোরক্ষা ও কেন্দ্রীয় সরকারের ‘যোজনা’ পত্রিকা

স্বস্তিকা পত্রিকার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় ‘সংবাদ প্রতিবেদন’ বিভাগে ‘বি এস এফের শিথিলতায় গো-পাচার বাড়ছে মালদায়’ শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র।

উক্ত প্রতিবেদনে মালদা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি দিয়ে সম্প্রতি গো-পাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তৎসহ উল্লেখ করা হয়েছে যে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার আসার পর সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এই গো-পাচারের মাত্রা বেড়ে গেছে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার (এনডিএ-২) এমন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যার ফলে এই নতুন সরকারের ভাবমূর্তি আরও মলিন হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা যোজনায় (সেপ্টেম্বর ২০১৪) রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের অন্তর্গত পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে দুগ্ধদান করবার ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যাবার পর গাভীদের মাংস ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ গো-হত্যা হবে। The scheme would also focus on upkeep of cattle after they are part the milk producing phase, when they can be utilised for meat : (YOJANA, September, 2014)

অথচ ভারতীয় জনতা পার্টি ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্‌কালে তাদের যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছিল, সেই vision document 2004 এ একজায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে— ‘The BJP is fully Committed to preserving India's animal wealth especially, to protection of Gou Mata (Cow) and her progeny.’

দুগ্ধদান ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও মাংসের জন্য গো-হত্যা করা উচিত হবে না।

তারপরও গোসম্পদকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তা শ্রীসেতুরা অসপরি লিখিত ‘Say No to beef’ পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে তার কিছু অংশ তুলে ধরছি।

“After a Cow stops offering milk at a particular age it generally lives for another 5-7 years and in due course the quantity of Cowdung it offers can keep our Organic farming alive which will provide us foodgrains many folds. For example let us take a cow lives for an average period of five years after it stops offering milk. Taking an average cowdung it provides per day is 10 kgs. Hence for a period of five years it works out to be 10×30×12×5=18000 kgs or 18 Toms, which can be utilised as organic manure for production of food grains many folds than normal production. This increase in food grains can feed people many folds than what beef can feed them out of a cow.”

আমি এতদ্বারা কেন্দ্রীয় শাসকদলের নেতৃবৃন্দের নিকট সর্নিবন্ধ অনুরোধ জানাই যে রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের অন্তর্ভুক্ত গো মাংস উৎপাদনের পরিকল্পনা অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন এবং ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির শ্রদ্ধেয় প্রতীক গোমাতাকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন।

—**কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,**
উত্তরপাড়া, হুগলী।

জাতপাত

সুন্দর মৌলিক-এর লেখায় একটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে যথা “এক হুঁকোয় তামাক খেতে হবে। জাত যায় যাক।” এটির প্রয়োগ বর্তমান সামাজিক চেতনায় না করাই উচিত। বিশেষত উনবিংশ শতকের রেনেসাঁস-এর ফলে এবং একবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতা ও বিশ্বায়নের দৌলতে একই হুঁকোয় তামাক খেলে জাত যায় এ ধারণা এখন সত্যই অচল। উপরন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শৈশবেই জগতকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ছোট জাতের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট হুঁকোয় তামাক খেলে জাত যায় না। অবশ্য ‘জাত জালিয়াত’রা তাদের ‘জাত-কল’ সর্বকালে সচল রাখার চেষ্টায় সচল থাকে। কাজেই সাধুকে সাবধান থাকতে হয়।

—**পরেশ চন্দ্র রায়,**
কদমতলা, দার্জিলিং।

নেশামুক্ত ভারত

ভারতকে নেশা মুক্ত করতে হলে, শুধু আইন করেই হবে না। চাই কঠিন সিদ্ধান্ত। আইনের যথার্থ প্রয়োগ। জনগণ আইন মেনে চলছে কিনা তা দেখা। দেশে বহু আইন আছে আমরা কয়জন সেই আইন যথাযথ মেনে চলি? যদি সবাই আইন মেনে চলত তবে সারাদেশে এত কেলেঙ্কারি হত না। নেশা মুক্ত ভারত গড়তে হলে প্রথমেই যা করা উচিত তা হলো, নেশা-জাতীয় সবকিছুর উৎপাদন ও বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

বয়সসীমা বেঁধে দিয়ে ধূমপান ও বিক্রি বন্ধ করা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ীরা ওই পথে হাঁটবেন না। ওই আইন সব রাজ্যও মানতে চায় না, কারণ রাজস্ব আয়ের বিষয়টিও রাজ্য সরকারকে ভাবতে হয়। যদি দেশের সব রাজ্য ওই আইন মেনে চলত তবে শুধু গুজরাট, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, লাক্ষাদ্বীপ এই কয়টি রাজ্য অ্যালকোহল মুক্ত হোত না—বাকি রাজ্যগুলিও হোত। মদের বোতলের গায়ে, বিড়ি, সিগারেটের প্যাকেটে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ করা আছে, এতে মদ্যপান ধূমপান কমেছে কি? বরং দশ বৎসর পূর্বে যে সংখ্যক মদের দোকান ছিল তা, বেড়ে ৫ গুণ হয়েছে। তাই সবধরনের নেশার দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি একযোগে সারাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করাই হবে সঠিক পদক্ষেপ। শুধু আইন করে কিছুই হবে না।

—**অনিল চন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবী বাড়ী, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

আমেরিকায় প্রধানমন্ত্রী

গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ রবিবার ভারতীয় সময় প্রায় রাত ৯-৩০ মিনিট-এ আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের ‘ম্যাডিসন স্কোয়ারে’ ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রবাসী ভারতীয়দের অভূতপূর্ব আবেগময় জয়ধ্বনি--- মোদী, মোদী, মোদীজী জিন্দাবাদ। প্রথমেই তিনি অভিভাষণে উপস্থিত হাজার হাজার সুধী প্রবাসী ভারতীয়দেরকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলের আকুতি সমন্বিত অভিনন্দন জানালেন। তিনি বললেন যে প্রায় ত্রিশ বছর পর আমাদের দল এককভাবে ভারতে এক বলিষ্ঠ ও স্থায়ী সরকার গঠন করেছে। এরজন্য তিনি সোয়াশো কোটি ভারতবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে এই মূহূর্তে ভারতের নিকট তিনটি প্রধান শক্তি আছে। গণতন্ত্র, মানব সম্পদ এবং চাহিদা। তিনি এই তিন ধরনের শক্তির সাহায্য ভারতকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চান। নেতাজী সুভাষচযন্দ্র বসু যে শৌর্যে ও বীর্যে বলশালীপূর্ণ স্বাধীন ভারতবর্ষকে চেয়েছিলেন, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকায় ভারতের সেই মহিমা ও ঐতিহ্যের কথা সকলকে শোনালেন। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে সকল আমেরিকাবাসী তথা বিশ্ববাসীর অন্তর জয় করেছিলেন নিজের জ্ঞানগর্ভ ও মর্মস্পর্শী মূল্যবান অভিভাষণের মাধ্যমে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদী প্রবাসী ভারতীয় তথা দূরদর্শনের মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসীর অন্তর জয় করলেন রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে তাঁর বলিষ্ঠ ও মর্মস্পর্শী উদাত্ত অভিভাষণের মাধ্যমে।

—**বিশ্বজিৎ বসু,**
সুভাষপল্লী, কলকাতা ১০৮।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০্ টাকা।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

দেবী জগদ্ধাত্রী

সন্দীপ কুমার দাঁ

একবার চার দেবতা, অগ্নি, বায়ু, বরুণ এবং চন্দ্র ভ্রান্ত গর্বের কারণে নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জগতের ঈশ্বর বলে সিদ্ধান্ত করেন। তাঁরা একথা ভুলে গিয়েছিলেন যে মহাশক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রীর শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান, দেবীর আনুকূল্য ছাড়া তাঁদের আলাদা কোনো শক্তি নেই। দেবী জগদ্ধাত্রী তখন এই দেবতাদের ভুল ভাঙানোর জন্য কোটি সূর্যের দীপ্তি নিয়ে উগ্রা জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে ওই দেবতাদের সামনে আবির্ভূতা হলেন। প্রথমে দেবী বায়ুকে সম্মুখে রাখা এক খণ্ড তৃণকে স্থানচ্যুত করতে বললেন, কিন্তু বায়ু তা পারলেন না। অনুরূপ ভাবে অগ্নিকে দেবী এক খণ্ড তৃণকে দগ্ধ করতে বললেন। কিন্তু অগ্নিও তা পারলেন না। পরাজিত ও লজ্জিত দেবগণ বুঝতে পারলেন যে এক খণ্ড তৃণের সমান শক্তিও তাঁদের নেই। তাঁরা আরো বুঝতে পারেন যে ওই জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিই সকল শক্তির আধার। রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, সোম প্রমুখ দেবতার যে শক্তি, তা দেবী জগদ্ধাত্রীরই দান। তিনি সবার শ্রেষ্ঠা, সকলের নমস্যা এবং আরাধ্যা। দেবীর শ্রীচরণে গর্বিত দেবতাদের শির অবনমিত হয়, তাঁরা বৃত হন জগদ্ধাত্রীর আরাধনায়।

বৃত্রাসুরের দাপটে যখন স্বর্গরাজ্য থরহরিকম্প, দেবতারা তখন দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করা শুরু করলেন। সেই প্রথম দেবী জগদ্ধাত্রীর অর্চনা হলো। কার্তিকী শুক্লা নবমীতে জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুর নিধনে সক্ষম হন।

দেবী জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা, নাগরূপযজ্ঞোপবীতধারিণী। তাঁর গাত্রবর্ণ প্রভাত সূর্যের মত। সিংহের পিঠে তিনি আড়াআড়িভাবে আসীন। তাঁর বামহস্তদ্বয়ে থাকে শঙ্খ এবং ধনু, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বাণ এবং চক্র। দেবী জগদ্ধাত্রী সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধৃতি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি। তিনি বিশ্বকে পালন এবং পোষণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।' কাত্যায়নী তন্ত্রে বলা হয়েছে, কার্তিকী শুক্লা নবমীতে জগতের শান্তিপ্রদায়িনী ও পালনকর্ত্রী দেবী জগদ্ধাত্রী প্রকটিতা হন। সেই কারণে ওই দিনটিতে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। উল্লেখ্য, জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনই শুরু ত্রেতা যুগের (প্রসঙ্গত, সত্যযুগ শুরু হয়েছিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এবং কলি যুগ শুরু হয় মাঘী পূর্ণিমার দিনে)

দেবী দুর্গারই আর এক রূপ দেবী জগদ্ধাত্রী। দেবী দুর্গা দশভুজা, দেবী জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা। দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী, জগদ্ধাত্রী করিন্দ্রাসুরনিসূদিনী।[১] জগদ্ধাত্রী পুজোর মধ্যে দুর্গাপুজোরই ক্রম অনুসরণ করা হয়। জগদ্ধাত্রী পুজো হয় কার্তিকী শুক্লা নবমী তিথিতে, যে তিথিতে দুর্গানবমী তিথিও বলা হয়।

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে চ যা দুর্গানবমী তিথিঃ।
সা প্রশস্তা মহাদেব মহাদুর্গাপ্রপূজনে।।

এখানে মহাদুর্গা অর্থ দেবী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং। দুর্গাপুজোর মতই সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপুজো, নবমী পুজো, চণ্ডীপাঠ এই পুজোতেও হয়।[২] এক্ষেত্রে একই দিনে সবকটি পুজো করা হয়।

প্রাতঃশ্চ সাত্ত্বিকী পূজা মধ্যাহ্নে রাজসী মতা।
সায়াহ্নে তামসী পূজা ত্রিবিধা পরিকীর্ত্তিতা।।

অর্থাৎ প্রাতে সাত্ত্বিকী, মধ্যাহ্নে রাজসী এবং সায়ংকালে তামসী পুজো করা কর্তব্য। আর এই হলো সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমী পুজো। অর্থাৎ বলা যায় সপ্তমীতে সাত্ত্বিকী, অষ্টমীতে রাজসী এবং নবমীতে তামসী পুজো। এই পুজো হয় তন্ত্রমতে। মায়াতন্ত্রে বলা হয়েছে—

পূজয়েজ্জগতং ধাত্রীং কার্তিকে শুক্লপক্ষকে।
দিনোদয়ে চ মধ্যাহ্নে তথা সায়াহ্নকেঽহগনি।।

অর্থাৎ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে জগদ্ধাত্রীর পূজা করিবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখা যায়, করীন্দ্রাসুর মহিষাসুরের অন্য রূপ। একবার মহিষাসুর মহাগজ বা করীন্দ্ররূপ ধারণ করে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। করীন্দ্ররূপ ধারণ করে সে প্রথমেই আক্রমণ করে দেবীর বাহন সিংহকে। সে তার লম্বা শুঁড়ের সাহায্যে সিংহকে আকর্ষণ করে যখন গর্জন করছিল, (সাধারত জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সঙ্গে করীন্দ্রাসুরকে এই অবস্থাতেই দেখা যায়), তখন দেবী খড়্গ দিয়ে করীন্দ্রাসুরের শুঁড়টি ছিন্ন করেন। করীন্দ্রাসুর রূপই মহিষাসুরের সর্বশেষ রূপ। করীন্দ্রাসুর বধে দেবীর মহিষাসুর বিজয় সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর দেবগণ দেবী মহামায়ার স্তব ও আরাধনা করেন।

দেবী জগদ্ধাত্রীর প্রণাম মন্ত্রেও তিনি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, দুর্গারূপেই তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে—

দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।
সর্বপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে।।

অর্থাৎ, হে জগদ্ধাত্রি! তুমি দয়ারূপা, তোমার দৃষ্টি করুণাভরা, দয়াতে তোমার হৃদয় নিত্য দ্রবীভূত, তুমি দুঃখ মোচন কর এবং সকল বিপদ নিবারণ কর, হে দুর্গে তোমাকে প্রণাম।

এই পুজো তিথিতৃপ্ত নয়, এ পুজো দিনকৃত্যের পুজো। তিথি যেদিন পড়েছে, সেই দিনই পুজো করার নিয়ম। শুধুমাত্র তিথি চলাকালীন পুজো করতে হবে, এ পুজোয় এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নিয়ম অনুযায়ী জগদ্ধাত্রী পুজো করা উচিত শুধুমাত্র নবমীতে। পুজোয় বসতে হয় সূর্যোদয়ের আগে। একই আসনে বসে সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত দফায় দফায় এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পুজো করার বিধি। ভোর চারটে থেকে নটা পর্যন্ত সপ্তমী পুজোর সময়, নটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত অষ্টমী এবং একটা থেকে চারটে পর্যন্ত নবমী পুজোর সময়। এই সময়ের মধ্যে অষ্টমী পুজো এবং নবমী পুজোর মাঝখানে সন্ধিপুজো করার নিয়ম। পুজো চলাকালীন অন্য কোনো কাজের জন্য পূজকের একবারও ওঠা নিষেধ। জগদ্ধাত্রী পুজো একদিনে নিষ্পাদ্য দুর্গাপুজো।

বলা হয়, বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূত্রপাত নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে, ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে। যদি খৃস্টীয় ষোড়শ শতকেরও আগে রচিত শূলপাণির ‘কালবিবেক’ গ্রন্থে কার্তিকমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পুজোর উল্লেখ থাকায় অন্তত পঞ্চদশ শতাব্দীতে জগদ্ধাত্রী পুজোর নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া কয়েকটি প্রাচীন পুঁথিতে যেমন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ‘তন্ত্রসার’, বৃহস্পতি বায়ুমুকুটের ‘স্মৃতিরত্নহার’ এবং শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণির ‘কৃত্যতত্ত্বার্ণব’ গ্রন্থেও দেবী জগদ্ধাত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘কাত্যায়নী তন্ত্র’ এবং ‘মায়াতন্ত্র’ গ্রন্থদুটির কথা তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও, ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’-এ উল্লেখ রয়েছে ১৭৫২ খৃস্টাব্দে জগদ্ধাত্রী পুজোর কথা। তবে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত জগদ্ধাত্রী পুজো থেকেই যে এই পুজোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

ফিরে আসি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী পুজোর কথায়। ১৭৬৪ খৃস্টাব্দ। বাংলার নবাব তখন মীরকাশিম। তিনি বিচক্ষণ, রাজকার্যে সুদক্ষ। তাঁর আত্মসম্ভ্রম ছিল, তিনি ইংরেজের তল্পিবাহক হতে রাজি ছিলেন না। এমনকী স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। তিনি যখন শাসন ক্ষমতা পেলেন, রাজ্যের অরাজক অবস্থাকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। ইংরেজদের দাপট থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি রাজধানী মুঙ্গেরে সরিয়ে নিলেন। এরপর তিনি ইংরেজদের যারা খয়ের খাঁ সেইরকম কিছু বড় বড় লোকের তালিকা তৈরি করলেন। উদ্দেশ্য, তাদের কব্জায় আনা। এই তালিকার একজন ছিলেন নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তখন বারো লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকি পড়েছে। তাঁর কাছে একদিন একটি আদেশ এল। তিনি যেন হুগলীতে এসে নবাবের সঙ্গে দেখা করেন। যাওয়া মাত্রই তিনি বন্দী হলেন, তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মুঙ্গেরে। অনেক চেষ্টা করেও কৃষ্ণচন্দ্র মুক্তি পেলেন না।[৩]

এদিকে গিরিয়ার মাঠে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরে পালিয়ে গেলেন। মুঙ্গের ছাড়ার আগে মীরকাশিম আদেশ দিলেন, কারাগারে যেসব মান্যবর ব্যক্তিরা আছেন তাঁদের খতম করার। যেদিন প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে, সেদিন সকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পুত্রকে নিয়ে (পুত্রও পিতার সঙ্গে বন্দী ছিলেন) পুজোয় বসলেন। ভক্তিভরে তাঁরা ইষ্টদেবতার পুজো করে চলেছেন, গরাদের বাইরে প্রহরীরা অপেক্ষা করছে। পুজো শেষ হলেই প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে। কিন্তু পুজো শেষ হবার আগেই ইংরেজরা মুঙ্গের দখল করল। ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সপুত্র সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পেলেন। চটজলদি বাড়ি ফিরতে ছিপনৌকোয় উঠলেন কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু অগ্রদ্বীপের কাছে রুকুনপুরের ঘাটে আসতেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শুনতে পেলেন দুর্গাপুজোর বিসর্জনের বাজনা বাজছে। তিনি বুঝতে পারলেন এবারের মতো পুজো শেষ। দুঃখে, শোকে, ক্লান্তিতে রাজা সংজ্ঞা হারালেন। স্বপ্নে এলেন মহামায়া রাজরাজেশ্বরী। এ এক অন্য রূপ। ঘোড়াদাবা সিংহে দেবী আড়াআড়িভাবে বসে আছেন। জগদ্ধাত্রীরূপেই রাজরাজেশ্বরী কৃষ্ণচন্দ্রকে আদেশ দিলেন শুক্লা কার্তিকী নবমী তিথিতে পুজোর আয়োজন করতে। প্রসন্ন হৃদয়ে মহারাজা ফিরে পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করে জানতে পারলেন, স্বপ্নে দেখা সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তির সঙ্গে দেবীপুরাণে উল্লিখিত দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপ একই। স্বপ্নে দেখা সেই মূর্তিতেই দেবীকে একদিনে ‘নিষ্পাদ্য’ দুর্গাপুজো হিসাবে জগদ্ধাত্রী দেবীরূপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আরাধনা করলেন। রাজরাজেশ্বরীর চরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সাধ অপূর্ণ রইল না মহারাজার।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলন করার পর রাজার আশ্রিত অনেকেই কৃষ্ণনগর শহরে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করলেন। আবার চন্দননগরের রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ কৃষ্ণচন্দ্রের দেখা চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন করলেন। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো চারিদিনের হলেও কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি বা কৃষ্ণনগরের অন্যত্র একদিনেই জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। কৃষ্ণনগরের বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয় রাজা গিরিশচন্দ্রের আমলে। অতঃপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত প্রতিমায় জগদ্ধাত্রী পুজো বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত হলো।

পরিশিষ্ট—

(১) *দেবী জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ বা নবপত্রিকা থাকেন না, পরিবর্তে দেবীর দুই পাশে থাকেন দুই সখী জয়া ও বিজয়া।*

(২) *তবে জগদ্ধাত্রী পুজোয় কোনো কল্পারম্ভ বা বোধন হয় না।*

(৩) *রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত হতাশ এবং বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ, দুর্গাপুজো তখন আগত প্রায়। রাজা ভাবলেন এবার আর তাঁর রাজরাজেশ্বরীকে (কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দুর্গাকে এই নামেই অভিহিত করা হয়) দর্শন বা আরাধনা করা হলো না।* ■

পরম্পরা

যোগাসন শিক্ষা আজ জরুরি

অর্জুনের মাধ্যমে শ্রীভগবান গীতায় বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন, যোগীই সকলের শ্রেষ্ঠ—তপস্বী, জ্ঞানী, কর্মী প্রভৃতি অপেক্ষাও। এই মত ব্যক্ত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিলেন, ''অতএব অর্জুন তুমি যোগী হও।'' মনে রাখতে হবে, ভগবান এমন কথা কোনো স্থান কাল পাত্র ভেদে করেননি। তাঁর এই উপদেশ সব কালের সব অঞ্চলের সমস্ত মানুষকেই উদ্দেশ্য করে। বোধহয় এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আরও যোগ করেছেন, ''যোগকর্ম সুকৌশলম্''। যোগকর্ম হলো সুকৌশলযুক্ত। অতএব সব কালের সব দেশের সব মানুষ তার প্রয়োজন মতো এই বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

ভারতবর্ষের এই অতি প্রাচীন শাস্ত্রটিকে কোনো একটি ধর্মের গণ্ডীতে বেঁধে ফেলার চেষ্টা ঠিক নয়। আধুনিক বিশ্ব যথার্থই তা উপলব্ধি করেছে। তাই ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের বেশিরভাগ দেশের জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে অগণিত নরনারী যোগশিক্ষা লাভ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন অফিসবাবুর মতো আপাত আরামপ্রিয় কর্মী থেকে কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিক পর্যন্ত সকলেই। ছাত্রছাত্রী, কর্মপ্রার্থী, অধ্যাপক, গবেষক, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, উদ্যোগপতি, সবসময় টেনশনে- ভোগা লোকজন, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কোনো দুর্ঘটনা কিংবা অসুখের কারণে শারীরিক অথবা মানসিক সংস্যা-পীড়িত ব্যক্তি, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী—কে নেই এই দলে! তাঁরা যথার্থই উপলব্ধি করেছেন, 'যোগ' কোনো সংকীর্ণ ধর্মমত বা ধর্মীয় ক্রিয়াকৌশল নয়। যোগ হলো একটি 'ওয়ে অফ লিভিং'— সুন্দর সুস্থ জীবন-যাপনের একটি পন্থা, যার লক্ষ্য— ''একটি সুস্থ শরীরের মধ্যে একটি সুস্থ মন''। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাধ্যাতীত ক্ষেত্রেও পৌঁছে যেতে সক্ষম যোগশাস্ত্রের আশীর্বাদ।

যোগের অনেক ভাগ। আমাদের মতো সাধারণ গৃহীর পক্ষে, যাঁদের জীবন সদাব্যস্ত, তাঁদের সকলের পক্ষে যোগের সমস্ত দিকে বিচরণ করা সম্ভব নয়। তাঁরা যোগাসন এবং প্রাণায়াম অভ্যাস করতে পারেন। যোগশাস্ত্র দাবি করে নারী-পুরুষ, বয়স, শারীরিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই যোগাসন করতে পারেন। নানা প্রকার ব্যায়াম ও শারীরিক কসরতের সঙ্গে যোগাসনকে অনেকে এক ভেবে বসেন। সাধারণ ব্যায়াম বা কসরতে কিছু শারীরিক লাভ হতেই পারে, কিন্তু সেখানে মনের বিকাশের ধারণা অনুপস্থিতই থাকে। যোগ শরীরের সঙ্গে মনের স্বাস্থ্যেরও পরিবর্তন ঘটায়। শরীর, মন ও আধ্যাত্মিক চেতনা নিয়েই একজন পূর্ণ মানুষ। যোগ এই তিনের সমন্বয়সাধন করতে সাহায্য করে, যাতে মানুষ আরও উন্নত হতে পারে। আর এই কাম্য অবস্থায় পৌঁছানো যায় যদি শরীর, মন ও আত্মার উপর একজন মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রকম মানুষই পরিবারে আদরণীয় পুত্রকন্যা, ভাইবোন এবং শ্রদ্ধেয় পিতামাতা, স্বামীস্ত্রী প্রভৃতি হতে পারেন। স্বভাবতই এমন মানুষরাই যে সমাজে প্রতিবেশী ও আত্মীয়, কর্মস্থল, রাজনীতি ও প্রশাসনে কর্মী ও নেতা হিসাবে প্রিয় হবেন, তা বলা বলাই বাহুল্য।

অনেকেই এটা জানি ও বিশ্বাস করি। তাই বই পড়ে, টিভি দেখে কিংবা কারও কাছে কিছু শুনে নিয়েই 'যোগাসন', 'প্রাণায়াম' অভ্যাস করে থাকি। এমন 'হাতুড়ে' ব্যবস্থায় বিশেষ ফল হওয়ার কথা নয়। যথারীতি হুজুগ থেমে যেতেই সব ছেড়েছুড়ে দেওয়া। এতে করে যোগশাস্ত্রটি সম্পর্কেই ভুল ধারণা গড়ে উঠছে। চিকিৎসা যেমন নিতে হয় কোনো সুশিক্ষিত ডাক্তারের কাছে, যোগসংক্রান্ত পরামর্শও তেমনি উপযুক্ত প্রশিক্ষকের কাছেই নেওয়া উচিত। কিন্তু তেমন সুযোগ সর্বত্র নেই। এই পরিস্থিতিতে সুখবর পাওয়া গিয়েছে, দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাসনের পাঠদানের ব্যবস্থা হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই নির্দেশ দিয়েছে ইউজিসি। সুযোগটি দেশের সব নাগরিকের জন্যই কীভাবে দ্রুত প্রসারিত হতে পারে, সরকারকে তা ভেবে দেখতে হবে। কারণ দেশের সার্বিক উন্নতি লক্ষ্য হলে সবরকমে সুস্থ নাগরিক তৈরি ছাড়া তা অধরাই থেকে যাবে।

(দৈনিক 'বর্তমান' পত্রিকার সৌজন্যে)

শরীরের মালমসলা

সুকুমার রায়

এখানে একটা বাকস আছে। বাকসটা কাঠের তৈরি। শুধু কাঠ? না, তাতে লোহার কবজা আর তালা আর চারধারে পিতলের কাজ আছে। আর কি আছে? আর তার গায়ে চকচকে গালা বা বার্নিস আছে। সামনে ওই একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? ইঁট, কাঠ, লোহা, চুন, সুরকি, বালি, সিমেন্ট, রং, তেল এইরকম সব জিনিস। এই সমস্ত হলো তার মালমসলা। যারা বাড়ি বানায় তারা হিসাব করে বলতে পারবে, এতে অমুক জিনিস এতখানি আন্দাজ লেগেছে— তার বাজার দাম এত। আচ্ছা— সামনে একটা মানুষ বসে আছে— বল তো কিসের তৈরি মানুষ? কিসের তৈরি, তার একটু নমুনা শুনবে?

দুমণ ওজনের একটি মানুষের শরীরের মধ্যে হিসাব করলে এক মণ জল পাওয়া যাবে— বেশ বড়ো-বড়ো তিন-চার কলসী জল। তার শরীরে যতরকম গ্যাস বাষ্প বা বাতাস আছে তা যদি আলাদা করে বার করতে চাও, তা হলে এত গ্যাস বেরোতে পারে যে তার জন্য বারো হাত লম্বা বারো হাত চওড়া আট হাত উঁচু একটা ঘর লাগবে। তার মধ্যে এমন অনেক খালি গ্যাস পাবে বাজারে যার দাম আছে— বিক্রি করতে পারলে প্রায় টাকা দশেক পাওয়া যায়।

ওই ওজনের একজন সাধারণ মানুষের গায়ে যত চর্বি আছে তা দিয়ে এক পোয়া ওজনের প্রায় গোটা ত্রিশেক মোমবাতি তৈরি হতে পারে। তাছাড়া খাঁটি অঙ্গার বা মূল-কয়লা এত পাওয়া যাবে যে তা দিয়ে দশ হাজার পেন্সিলের শিষ তৈরি হতে পারে। বারো সের পাথুরে কয়লার মধ্যেও অতখানি অঙ্গার থাকে না।

খোঁজ করলে একটা শরীরের মধ্যে থেকে প্রায় কুড়ি চামচ নুন আর দু-তিন মুঠো চিনি অনায়াসেই বার করা যেতে পারে।

যে সমস্ত জিনিস না হলে শরীর টিকতে পারে না তার একটি লোহা। এই যে রক্তের রং দেখছ, টকটকে লাল, শরীরে লোহা কম পড়লেই সে রঙ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, কঠিন ব্যারাম দেখা দেয়। তখন মানুষকে লোহা-মেশানো ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে যে লোহার মসলা থাকে, ইচ্ছা করলে তা থেকে লোহা ধাতু বার করে খাঁটি শক্ত লোহা বানানো যায়। একজন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ লোহা বেরোয় তা দিয়ে একরকম মোটা একটি পেরেক তৈরি হতে পারে যে, একটা আস্ত মানুষকে অনায়াসে সেই পেরেক থেকে টাঙিয়ে রাখা যায়।

মানুষের শরীরে যে হাড় থাকে তা থেকে দুটি জিনিস খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়— চুন আর ফসফরাস। চুন দিয়ে কত কাজ হয়, তা সকলেই জান। ফসফরাস দিয়ে দেশলাইয়ের জ্বালানি মসলা তৈরি হয়, আর ইঁদুর মারবার সাংঘাতিক বিষ তৈরি হয়। অনেক ওষুধেও ফসফরাসের ভাগ থাকে। গুড় পুড়িয়ে জমির সঙ্গে মেলালে যে চমৎকার সার হয় সেও ওই ফসফরাসের গুণে। একটি মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ খাঁটি ফসফরাস বার করা যায় তা খাওয়ালে অন্তত পাঁচশো মানুষ মারা পড়বে। দেশলাই বানালে তাতে প্রায় আট লক্ষ দেশলাইয়ের মসলা হবে।

১৯১৬ সালে প্রকাশিত

সংকলন : কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. ভূস্বর্গ ভারতের কোন্ অঞ্চলকে বলা হয়? কে প্রথম বলেন?
২. কাশ্মীরের কয়েকটি দেখার জায়গার নাম?
৩. কোন্ কোন্ নদী আছে কাশ্মীরে?
৪. কাশ্মীরের প্রধান ভাষা কি কি?
৫. কাশ্মীরে শীত ক'মাস থাকে? কোন্ সময়ে?

উত্তর ১. কাশ্মীর উপত্যকা। সম্রাট জাহাঙ্গির। ২. শ্রীনগর - ডাললেক, মোগলগার্ডেন, গুলমার্গ, পাহেলগাঁও, সোনমার্গ, অমরনাথ লে-লাদাখ। ৩. ঝিলম নদী, লিদার, সুরু, সিন্ধু। ৪. কাশ্মীরি, ডোগরি, লাদাকি, উর্দু, হিন্দি। ৫. ছ'মাস। অক্টোবর থেকে মার্চ।

ফিরে পড়া

বুড়ো-বুড়ি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বুড়োবুড়ি দুজনাতে
মনের মিলে সুখে থাকত।
বুড়ি ছিল পরম বৈষ্ণব,
বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।
হত যখন ঝগড়াঝাঁটি,
হত প্রায়ই লাঠালাঠি,
ব্যাপার থেকে ছুটোছুটি,
পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত।
হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' বলে,
কোথা বুড়ো গেল চলে,
বুড়ি তখন বুড়োর জন্যে
কল্লে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছরখানেক পরে
বুড়ো ফিরে এল ঘরে,
বুড়ি তখন রেঁধে বেড়ে
তাকে ভারি খুশি রাখত।
ঝগড়াঝাঁটি গেল থেমে,
মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ি দিত দাঁতে মিশি
বুড়ো গায়ে সাবান মাখত।

লাভ জিহাদের ফাঁদ

দীপা হাতি

আমরা প্রগতীশীল। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অনেক এগিয়েছে। আর প্রাচীন ধ্যান ধারণা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আজ নারী-পুরুষ সমান। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, সবাই সমাজের দায়িত্ব নেবে। কোনো আলোচনা সভায় আমরা এইসব কথা শুনতে পাই। তবু প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললে ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বধূহত্যা, মেয়েদের পতিতালয়ে বিক্রি, মধুচক্র চালানো, মেয়েদের নগ্ন ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি এই সবেই সংবাদপত্রের পাতা ভর্তি থাকে। একজন মহিলা হিসাবে এইসব সংবাদ পড়তে আমার ভীষণ কষ্ট হয়।

আমরা পড়ে এসেছি 'সতী, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী আমরা তাদেরই সন্ততি'। আমরা জানি রানী লক্ষ্মীবাঈ ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছেন। আমরা জানি অগ্নিযুগে কত বীরাঙ্গনা দেশ স্বাধীন করার জন্য সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে পুরুষদের মতোই লড়াই করেছেন। কোনো দিনই ভারতীয় মেয়েরা পিছিয়ে ছিল না। তাহলে আজ এমন কী হলো যে মেয়েরা আজ এত অপমান, এত হেনস্থার শিকার হচ্ছে? আমাদের এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। আজ আর প্রতিবাদের দিন নেই।

এবার মেয়েদের অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের পথে যেতে হবে। কেননা নতুন বিপদ যুক্ত হয়েছে 'লাভ জিহাদ'। এই দুটি শব্দ বাজারে খুব চলছে। হিন্দু মেয়েদের প্রেমের অভিনয় করে ফাঁদে ফেলে বিয়ের নামে অভিনয় করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। এমনকী মেয়েদের বাধ্য করা হচ্ছে খারাপ কাজে নামতে। আমাদের স্কুল কলেজে পড়া মেয়েরা টেকদার জামা কাপড় পরা, সঙ্গে বাইক বা মোটর গাড়ি থাকা যুবকদের নজরে পড়ছে। তাদের নাম জানতে চাইলে কেউ বাপি, মুন্না, খোকা, বুড়ো, পাপ্পু নাম বলছে। কয়েকদিন তাদের সঙ্গে একটু গভীরভাবে মেলামেশা করার পর জানতে পারছে আসলে তারা এই সব নাম মুখোশ হিসাবে ব্যবহার করেছে। আসলে তারা কেউ আলাউদ্দিন, কেউ বা ফজল, রহমান কেউবা অবদুল বা আসরাফ। যারা এসব জেনে ফিরতে পেরেছে তারা ভাগ্যবতী। বাকিরা শিকার হয়েছে ওদের হীন প্রস্তাব মানতে। বাধ্য হয়েছে ওদের কুকাজে অংশ নিতে। এরই নাম 'লাভজিহাদ'। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু মেয়েদের ফাঁদে ফেলা হচ্ছে, আমাদের রাজ্য তাদের মধ্যে অন্যতম। সরকার ভোটের লোভে চুপ।

আমাদের এই ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। কেন আমাদের মেয়েরা এই প্রলোভনে পা দিচ্ছে? আমার তো মনে হয় এর বেশ কিছু কারণ আছে। তা হলো, (ক) এক শ্রেণীর মেয়ে সব ব্যাপারেই উগ্রতা পছন্দ করে। তারা স্বাধীনতার নামে লাভ জিহাদের পাতা ফাঁদে পা দেয়। (খ) কিছু মেয়ে মজা হিসাবে বা হালকা ভাবে ব্যাপারটা নেয়। হালকা ভাবেই মেলামেশা করতে যায়। কি পরিণতি হতে পারে তা তখন ভাবে না। (গ) আমাদের এই সমাজের অনেকেই বিয়ের খরচের কথা মাথায় রেখে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে যায়। সেখানে পরিবারের আর্থিক অবস্থাটাই একটা বড় কারণ।

যতই আমরা আধুনিক হচ্ছি, ততই আমাদের বিয়ের খরচ বাড়ছে। যৌতুকের চাহিদাও বাড়ছে। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে যৌতুকেও আধুনিকীকরণ হচ্ছে। আগে বিয়েতে একটা সাইকেল পেলেই বরপক্ষ খুশি হোত। এখন অতি সাধারণ ঘরের বিয়েতেও সোনা, আসবাবপত্রের সঙ্গে নিদেনপক্ষে একটা দামী মোটর সাইকেলের চাহিদা থাকছে। একটু অবস্থাপন্নের কথাতো বলার মতোই নেই, সেখানে চাহিদা অনন্ত। সঙ্গে নগদ টাকাতো আছেই। তাইতো বাধ্য হয়েই কন্যাভ্রূণ হত্যার দিকে সমাজ এগুচ্ছে। আইন আছে ঠিকই, তবু মনে নানা প্রশ্ন তো মানুষের আছেই। আমরা সবাই সমালোচনা করে কাটিয়ে দিই, সমাধান কি বলি না।

আমার তো মনে হয় সামাজিক বিবাহ বা Arrange marrige এর উপর বেশি নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সঙ্গে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চালাতে হবে। যেভাবে পাড়ায় পাড়ায় 'রক্তদান শিবির' হয় সেই ভাবেই পাড়ায় পাড়ায় 'পণপ্রথার' বিরুদ্ধে যুবকদের সঙ্গে অভিভাবকদের পণ না নেওয়ার অঙ্গীকার নিতে হবে। তাদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে। সঙ্গে তাদের প্রশংসাপত্র দিতে হবে। যাতে একবার অঙ্গীকার করে চুক্তিভঙ্গ না করতে পারে। এজন্য একটা সামাজিক চাপ তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন পূজামণ্ডপে তাদের সম্মান জানানোও যেতে পারে। এই কাজে সমাজের সকল শ্রেণীকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আমি যখন বিদ্যার্থী পরিষদ করতাম তখন আমাদের কোষাধ্যক্ষ পণ না নেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন। খবরের কাগজে তার একটা ছোট সংবাদও ছিল। পরবর্তীকালে সত্যি বিয়েতে সে একটা টাকাও নেননি। হাওড়ায় এক আদর্শবাদী যুবক হিসাবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান হয়েও সেইদিন ওই রাজস্থানের ছেলেটি আমার কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন।

আজ আমাদের কিসের অভাব? আমরা কি অধিক সংখ্যায় এই ধরনের যুব বন্ধু পেতে পারি না? যাদের হাত ধরে হিন্দু মেয়েরা 'লাভজিহাদ'-এর বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমাদের মায়েদেরও নারীনির্যাতন থেকে লাভজিহাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তারা সচেতন হলেই এইসব অপকর্ম বন্ধ হতে বাধ্য। ■

হায় নালন্দা !

অতিথি কলম

নলিন মেহতা

অতীত ইতিহাস অনুযায়ী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে গেলে তৎকালীন নিয়ম অনুসারে প্রবেশদ্বারে উপবিষ্ট 'দ্বার পণ্ডিত' তথা প্রবেশ-অভিভাবকের তীক্ষ্ণ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে তবেই প্রবেশ-যোগ্যতা অর্জন করতে হতো।

ভেবে দেখুন সেই সময় ১০ জন প্রত্যাশীর মধ্যে সাকুল্যে মাত্র একজনই সেই কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতের অক্সফোর্ডে পড়াশোনার অধিকার পেত। এখানে খেয়াল রাখা দরকার বিশ্ববিশ্রুত অক্সফোর্ড কিন্তু এর বেশ কয়েক শতাব্দী পরে মাত্র ১০১৬ খৃঃ আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভারতের নালন্দা তখন খ্যাতির মধ্য গগনে।

ভারতে আজ দ্বিতীয় নালন্দার স্বপ্ন জারিত হচ্ছে। এই মর্মে বিহার বিধানসভায় অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প নিয়ে একটি বিল পাশ হওয়ার ৭ বছর পরে বিলটি ভারতীয় সংসদে অনুমোদনের অপেক্ষায় ৪ বছর ফাইলবন্দী থাকে। এই প্রাচীন গরিমার স্বপ্ন ১১ বছরের স্থবিরত্ব অধ্যায় পার করে সম্প্রতি মাত্র ১৫ জন ছাত্র নিয়ে রাজগীরে বাস্তবতার আলো দেখেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সীমানা পাঁচিল ব্যতিরেকে একটি ইট না গাঁথা সত্ত্বেও অতীত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে স্বপ্নে মশগুল এখানকার উপাচার্য বলে ফেললেন—

> **নালন্দার মতো বিশ্ববন্দিত অতীত বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক ভারতবাসীর আরাধ্য কিন্তু বিহারে সেই অর্থে যে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে তাকে একমাত্র ভগবানই রক্ষা করতে পারেন।**

নালন্দায় শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত হবে ১ : ৮। হায় রে! কি বাস্তব সম্পর্কহীন কল্পনাবিলাস। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজের অনুপাতও ১ : ১১। হ্যাঁ, যাকে কেউ কোনো ভাবেও সমালোচনা করতে পারে না বলে যিনি মনে করেন সেই অমর্ত্য সেন যেখানে জড়িত রয়েছেন, যিনি আবার নালন্দার আচার্যও বটে, সেই হার্ভার্ডে এই অনুপাত ১ : ৭। কিন্তু হার্ভার্ডের ঘরে রয়েছে ৩০ বিলিয়ন ডলারের বিশাল পুঁজি যাকে দিয়ে সব স্বপ্ন রূপ দেওয়া যায় সেখানে নালন্দা ১০ বছর ধরে পাবে ৪৪৬ ডলারের ক্রমিক অনুদান। মুড়ি মিছরি কি হঠাৎ এক হতে পারে?

অবশ্যই নালন্দার স্বপ্নকে দমিয়ে রাখা দুষ্কর। সুদূর অতীতের সাক্ষ্যবাহী এর দীর্ঘ ধ্বংসাবশেষের ক্ষয়িষ্ণু উঁচু নিচু বৌদ্ধ বিহারগুলি দর্শনে আজও মানুষের মনে স্বর্ণাভ অতীতচারিতার মায়াজাল ছায়া ফেলে। কিংবা এখানকার কিংবদন্তী পণ্ডিত শীলভদ্র বা চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ-এর সঙ্গে শুধুমাত্র দেখা করার আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করতেন কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন যিনি কামরূপের রাজার মাথা কেটে ফেলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যা স্মরণ করলে গায়ে কাঁটা দেবে। হিউ এন সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন এমনই ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মাহাত্ম্য আর এমনই ছিল এখানকার পড়ুয়াদের পাণ্ডিত্য, যে অনেক ব্যক্তিই নালন্দার ছাত্র বা অধ্যাপকের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বা নালন্দার প্রাক্তনী এমনটা বলেও অনায়াসে তাদের কার্যোদ্ধার করে নিত।

সুতরাং বোঝাই যায় এই নালন্দা নামের পুনরুদ্ধারে আজকে যাঁরা লেগে পড়েছেন তাদের রোমান্টিক হয়ে পড়ার কিছু কারণ নিশ্চয় আছে। চরম উৎকর্ষ ও গৌরবের সময় নালন্দার ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০ হাজার ও ২ হাজার। কিন্তু নালন্দার নামে শিহরণ বা রোমান্টিকতা জাগলেও তা কখনই বাস্তবের পরিপূরক হতে পারে না বিশেষ করে যখন তৈরি করার লক্ষ্য হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার।

এখানে বলা দরকার— নালন্দা একটি সংস্কৃত শব্দ। এটি তিনটি শব্দের সমাহার। ন+আলম+দা যার অর্থ দাঁড়ায়— 'মানুষের জ্ঞানের সহজাত ক্ষমতাকে থামিয়ে রাখা যায় না' (no stopping of the gift of knowledge।) নালন্দা-২ তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের বিশ্ববাসীকে দেওয়া এই দৃপ্ত অতীত উপহারের পুনঃসংস্করণ নির্মাণ।

প্রসঙ্গত ২০০৭ সাল থেকে হওয়া ইস্ট এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে কোনো বিদেশমন্ত্রীই এই বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের ঢাক বাজাবার সুযোগ অবহেলা করেননি। এমনকী বিদেশ দপ্তরের অধীনে একটি স্বাতন্ত্র্য নালন্দা সেল রয়েছে। নেই নেই করে এক ডজন দেশ ভারতকে এই সূত্রে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চীনারা একটি পৃথক পাঠাগার নির্মাণ করবে। সিঙ্গাপুর

দেবে যাবতীয় পুস্তকরাজি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই শুভাকাঙ্ক্ষীরা লক্ষ্য করছেন ভারত গৌরব পুনঃসংস্কৃত অভীষ্ট নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কাজ ভারতের চিরকালীন ধ্বংসাত্মক ঢিলেমি ও ফাইল ঠেলাঠেলির বদ্ধ জলাশয়ে আটকে রয়েছে।

দেশে নবনির্মিত কিছু আই আই টি বা আই আই এম এই মর্মে অনুসরণযোগ্য হতে পারত। তারাও এই চিরাচরিত অধ্যাপক ঘাটতি বা লাল ফিতের বাঁধন খুলে কেমন এগিয়ে গেছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের নালন্দা ঘোষণার ৩ বছর পরে আই আই এম উদয়পুরের ঘোষণা হয়। এই ঘোষণার সময় বিহার বিধানসভায় নালন্দা-২ বিল পাশ হয়ে দু বছর বিশ্রামরত। কিন্তু ৫৮ জন ছাত্র নিয়ে ২০১১ সালেই সফলভাবে চালু হয়ে গিয়েছিল আই আই এম উদয়পুর। আরও বলতে হয়, আই আই টি গান্ধীনগরের কথা। ২০০৮ সালে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই ওয়ার্ল্ড এডুকেশন সামিট-এর শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখার মহার্ঘ্য খেতাব জিতে নিয়েছে। শীঘ্রই তারা নতুন বিশাল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এরই বিপরীতে নীতিশ কুমারের সদিচ্ছা ও শিক্ষাবিদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ উৎসাহ সত্ত্বেও গত ১০ বছর ধরে কি করে একটা জিনিসকে তলিয়ে দেওয়া যায় নালন্দা-২ তার এক নিন্দিত প্রমাণ রেখেছে। ইতিমধ্যে এই কামধেনুটিকে দোহন করার জন্য নানান মন্ত্রক যেমন অর্থ ও বৈদেশিক নিজেদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

উপাচার্যের নিযুক্তিও অবাঞ্ছিত বিতর্কের মুখে পড়েছে। সব দেখে শুনে এর প্রথম চালিকাশক্তি আবদুল কালাম ছেড়ে চলে গেছেন। বীতশ্রদ্ধ অমর্ত্য সেন উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন, এমন একটা হতশ্রী পরিস্থিতি ও নিকম্মা আমলাদের মোকাবিলা করতে হলে হয়ত আদি নালন্দার শীলভদ্রও এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে পারতেন না। এটি নির্মাণ স্বপ্নে বিভোর নিয়ামক ও ভাবলেশহীন আমলাদের যাঁতাকলে পড়ে স্বপ্নের নালন্দা-২ আজ এক করুণ বিদ্রূপে পরিণত হতে চলেছে।

কিন্তু হায়! এটা তো কোনো হাসির ব্যাপার নয়। নালন্দার স্বপ্ন ছেড়ে দিলে হবে না। একে ছেড়ে দেওয়া যায় না। স্বপ্ন দেখলেই অতীত স্ফূর্তির পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয় না। স্মৃতিমেদুরতা আর রোম্যান্টিকতার সন্ধি হলেই তারা সিমেন্ট-লোহায় পরিবর্তিত হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে দিতে পারে না। হ্যাঁ, ভারতের হাজারটি নালন্দার প্রয়োজন আছে তবে শুধুই ফলক-সর্বস্ব বা 'নাম কা ওয়াস্তে' হওয়া নালন্দা-২ এর মতো বস্তু হলে অবশ্যই অন্য কিছু দরকার। এটি নয়। ■

(সৌজন্য : টি ও আই)

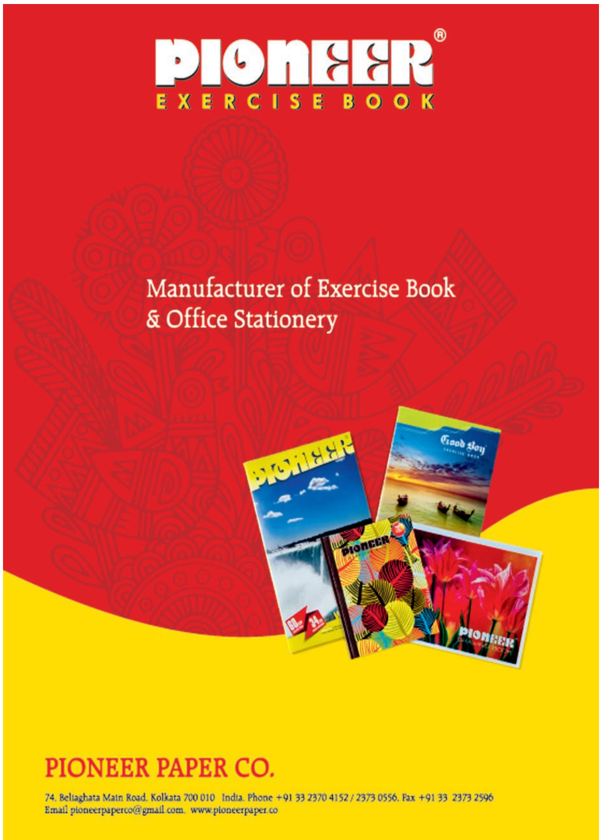

নেত্রদান মহাদান

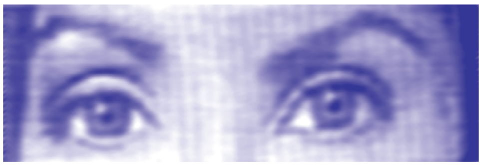

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

জাওয়াহিরির ঘোষণা জামায়াতের স্বপ্নেরই ধারাবাহিকতা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ বর্ধমান বিস্ফোরণ ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ সীমান্ত রাজ্যগুলো এবং বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা যে এক সুতোয় গাঁথা হচ্ছে, তার চেহারাটা সামনে এনে দিয়েছে। সারদা কাণ্ডে মঞ্চের পর্দা উঠেছে, আর বর্ধমানের খাগড়াগড় দৃশ্যের সূচনা করেছে। তারপর একের পর এক জঙ্গি আস্তানা, জঙ্গিরা ধরা পড়ছে ভিন রাজ্যেও। জানা যাচ্ছে নানা ষড়যন্ত্রের কথা। খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণে মারা গেছে জামা আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) দুই জঙ্গি, গুরুতর আহত হয়েছে আরেক জঙ্গি। এই সেই মুজাহিদিন, যারা এক এক যুগ আগে বাংলাদেশে একই দিনে প্রায় একই সময়ে প্রত্যেকটি জেলায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। তাগুতি আইন (প্রচলিত) বাতিল করে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে দুই বিচারককে হত্যা করে ঝালকাঠিতে, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম আদালত ভবনে বোমা মেরে হত্যা করে কয়েকজন আইনজীবীকে। সেই জঙ্গি তৎপরতা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নেই। লক্ষ্য ভারত, মায়ানমার ও বাংলাদেশকে নিয়ে এক অখণ্ড ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করা। জামা আতুল মুজাহিদিনসহ নিষিদ্ধ ও প্রকাশ্য সব ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের মাথায় ছাতা ধরে আছে জামায়াতে ইসলামি। প্রয়োজনে নতুন জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলে, যেমন বাংলাদেশে একাত্তরের ঘাতকদের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে গণ জাগরণ মঞ্চ শাহবাগে আন্দোলন শুরু করলে তাৎক্ষণিকভাবে জন্ম দেওয়া হয় হেফাজত ইসলামের। জামায়াতে ইসলামি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করেছিল, অখণ্ড ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান স্বপ্ন ছিল তখন থেকেই। কয়েক মাস আগে আল কায়েদা নেতা জাওয়াহিরির এই উপমহাদেশে আল কায়েদার শক্তিশালী

নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ঘোষণা এই স্বপ্নেরই ধারাবাহিকতা। জামায়াতে ইসলামি যে যুক্তিতে ভারত ভাগের বিরোধিতা করেছিল তা হচ্ছে, অখণ্ড ভারতে কালক্রমে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

অথচ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন এই জামায়াতি ও জঙ্গি রাজনীতি নির্মূল করতে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী ঘাতকদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন এবং জঙ্গিদের ধরপাকড় শুরু করেছেন, তখন তারা বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর অভিযান এড়াতে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছে। আর তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। গণজাগরণ মঞ্চ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে চরম দণ্ড দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা ও বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ সমাবেশ করে। অবিলম্বে জামায়াত নেতাদের বিচার বন্ধের দাবি জানানো হয়, কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করা হয় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে। অথচ গণজাগরণ মঞ্চের সমর্থনে এবং যুদ্ধপরাধীদের বিচার অব্যাহত রাখার দাবিতে কলকাতায় মিছিল করতে দেয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা।

বর্ধমান বিস্ফোরণের প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ ২০১১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর ঢাকা সফরের সময় থেকে পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখছেন। মনমোহন সিং-এর ঢাকা সফরে পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হওয়ার কথা জানানো হয়। তখন বাংলাদেশের খবরের কাগজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা হোত না, লেখা হোত 'দিদি'। খবরের শিরোনাম হয়েছিল, 'দিদি আসছেন, বাংলাদেশ তিস্তার জল ও সীমান্ত চুক্তি পাচ্ছে।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনমোহন এলেন ছয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে। মমতা এলেন না। তিনি জানিয়েছেন, তিস্তার জল ও সীমান্ত চুক্তি হবে না। সফরে অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন মনমোহন। অনিশ্চিত হয়ে পড়লো ট্রানজিট। এই খবরটি কিন্তু পাকিস্তানি পত্রপত্রিকায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খবর হিসেবে স্থান পায়। কলকাতার কাগজে মনমোহনের সফরের কয়েকদিন আগেই খবর বেরিয়েছিল, পাকিস্তানি হাইকমিশনার দিল্লী থেকে কলকাতা উড়ে এসেই বিমানবন্দর থেকে

ছুটে আসেন, মমতার সঙ্গে বৈঠক করেই দিল্লী উড়ে যান পরের ফ্লাইটে। নিখুঁত ছক।

এর পরে আসা যাক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে। যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত শীর্ষ জামায়াত ও বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, বাড়িঘর, দোকানপাট ও মন্দিরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুটপাট ও ধর্মান্তরিত করার যেসব অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে তার সিংহভাগের শিকার হিন্দুরা। ধর্ষিত ও স্বামীহারা হিন্দু নারীরা নির্ভয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালতে এসে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কাঠগড়ার দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন, 'ওই আমাকে ধর্ষণ করেছে, আমার স্বামী সন্তানকে হত্যা করেছে। আমি এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলাম, আমি ওর মৃত্যুদণ্ড চাই।' আরেক নারী বলেছেন, 'ওই জামায়াতি আমাকে ধর্ষণের পর পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় সেনারা আমাকে বাংকার থেকে উদ্ধার করে।' দেলাওয়ার হোসেন সাঈদির এলাকা পিরোজপুরের এক বর্ষীয়ান হিন্দু আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছেন, 'আমাদের পাড়ার সবাইকে ধরে মসজিদে নিয়ে যায় ওই পিশাচ ও তার সাগরেদরা, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও গোমাংস খেতে বাধ্য করে।' আন্তর্জাতিক আদালতে যাঁরা হতভাগ্যদের সাক্ষ্য শুনেছেন, চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। গ্রামে একটির পর একটি হিন্দুপাড়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে, নারীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার পর শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাসফায়ারে হত্যা করা হয়েছে। লুঠপাটের পর পেট্রোল ঢেলে ধ্বংস করা হয় গোটা পাড়া। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া সদস্য সাক্ষ্য দিতে এসে চিৎকার করে বলেছেন, 'ওই দুর্বৃত্তের অন্তত তিনবার ফাঁসি চাই।' চট্টগ্রামের কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর নতুন চন্দ্র সিংহকে দেবী কুণ্ডেশ্বরীর (জগদ্ধাত্রী) পুজো করার সময় ধরে নিয়ে যায় বর্তমান বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও পাকিস্তানি সেনারা। প্রথমে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে আহত করার পর গুলি করে হত্যা করা হয় এই সত্তরোর্ধ মানুষটিকে। তাঁর ছেলে প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস আন্তর্জাতিক আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার পর সাংবাদিকদের বলেছেন, 'এখন আমি তৃপ্ত। আমি জানি, এই সাক্ষ্যের জন্যে হয়তো আমাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু তাতে আমি ভয় পাই না।' কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা ধীরেন দত্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে (পার্লামেন্ট) সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনিই সবার আগে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার বিরোধিতা করেন, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুদের ভাষা হিসেবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করার কয়েকদিনের মধ্যে পাকিস্তানি সেনারা জামায়াতিদের নিয়ে ধীরেন দত্তকে খুঁজে বের করে। তাঁকে গুলি করে হত্যা করে উর্দুর বিরোধিতা করার শোধ নেওয়া হয়। হিন্দুশূন্য পাকিস্তান তৈরি করার যে পরিকল্পনা করেছিল পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরতন্ত্র ও শাসকগোষ্ঠী এবং জামায়াতি নেতা-কর্মীরা, তাদের পক্ষে এখন দাঁড়াচ্ছেন মার্কিন প্রশাসন ও তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে ভারতবাসীরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, এই ক্ষমতালোলুপতা যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। ■

Ori Plast

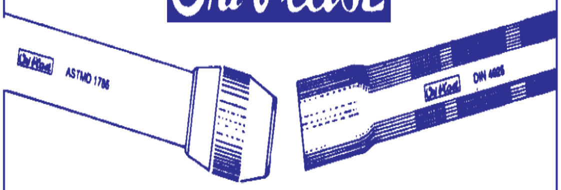

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

আন্তর্জাতিক

নাইজেরিয়ায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিপদ বেড়েই চলেছে

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদের শিকার পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়াও। পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়ায় ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত মানুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। কিন্তু নাইজেরিয়াতেও ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বল্গাহীন সন্ত্রাস ও জাতি হিংসার ঘটনা পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটিকেও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নাইজেরিয়া জুড়ে সন্ত্রাসবাদীরা যে আক্রমণ শানিয়ে চলেছেন তার পরিণতিতে ভীত সন্ত্রস্ত খৃস্টান

বোকো হারাম প্রধান আবুবকর শেকাউ।

সম্প্রদায়ের মানুষজন। নাইজেরিয়াতে আল কায়দা, তালিবানি প্রভাব কাজ করছে। কিভাবে এই দেশে জাতি হিংসা সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে তা বুঝে উঠতেই পারছেন না নাইজেরিয়ার শাসকেরা। একইভাবে ক্যাথলিক চার্চও নাইজেরিয়ার পরিস্থিতিতে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। ভ্যাটিকানও নাইজেরিয়ায় ইসলামি আগ্রাসনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। শুধু নাইজেরিয়াই নয়, নাইজেরিয়া-সহ সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকাতে ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের প্রভাব বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, নাইজেরিয়াতে বোকো হারাম নামে ইসলামি সন্ত্রাসবাদী দল ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত হত্যা করেছে বারো হাজার মানুষ ও আহত করেছে ততোধিক। সন্ত্রাসবাদ হত্যাকাণ্ডে চিরদিনই সক্রিয়। কিন্তু বোকো হারাম সম্প্রতি একটি বিদ্যালয় থেকে তিনশ বালিকাকে অপহরণ করেছে। তার মধ্যে পঞ্চাশ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। দু' জন সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে। এই দলের প্রধান আবুবকর শেকাউ বলেছেন, বাকিদের ক্রীতদাস বানাবার জন্য বিক্রি করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে কিছু মেয়েকে যে যার মতো বিয়ে করে নিয়েছে, জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এক ঘণ্টার ভিডিও প্রোগ্রামে তিনি এই সব জানিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীরা এর আগেই অপ্রাপ্তবয়স্কদের মানব বোমা, অস্ত্রধারী বানিয়েছে। এবার তাদের নিয়ে আল্লার নামে ক্রীতদাস করার পরিকল্পনা করেছে। আবুবকর ঘোষণা করেছেন, কোনো বিদ্যালয়ে পশ্চিমী শিক্ষা দেওয়া চলবে না।

নাইজেরিয়া দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী হলো খৃস্টান। বোকো হারামের আক্রোশ তাদের উপর। ইসলামের এ এক অদ্ভুত মানসিকতা— মুসলমান প্রধান দেশে অমুসলমানদের স্বাধীনতা খর্ব করা হবে, এমনকী দেশ ত্যাগেও বাধ্য করা হবে। যেমনটি আমরা প্রত্যক্ষ করি দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান ও বাংলাদেশে। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান শিখেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। অথচ অন্য চেহারা যে সব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। যে দেশে মুসলমান সংখ্যালঘু সেখানে সকলের সঙ্গে সমঅধিকারের দাবি করা হবে। এটা যে আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় সম্ভব নয় তা মনে রাখা হয় না। নাইজেরিয়ার এই অমানুষিক ঘটনার প্রতিবাদে কিন্তু মুসলমান বিশ্ব প্রায় নীরব। ভারতের মুসলমান সংগঠকরা, এমনকী বাংলাদেশেও উদারপন্থী মুসলমানরা নীরব থাকায় আশ্চর্য বোধ করেন পর্যবেক্ষক মহল।

এদিকে নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট গুডলাক জোনাথান জানিয়েছেন যে, বোকো হারামের সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার জন্য অন্তত পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য আফ্রিকার ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা

প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত ক্যামেরুন, নাইজার, বেনিন, চাদ এক সঙ্গে অভিযানের কথা ঘোষণা করেছে। ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আমরা বোকো হারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। প্যারিসে আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স ইউরোপীয় ইউনিয়ন একত্র বসেছে। ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট হল্যান্ডে জানিয়েছেন, আঞ্চলিক যৌথ অভিযান ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

বোকো হারামের অন্যান্য ইসলামি সন্ত্রাসবাদীর মতোই দাবি, সমগ্র নাইজেরিয়াতে শারিয়া আইন চালু করতে হবে। কিন্তু অমুসলমানেরা শারিয়া আইন অনুসরণ করবে কেন? এই যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নের কোনো উত্তর তাদের কাছে নেই। কোনো পৌত্তলিক দেশে কি মুসলমানেরা দেব-দেবীর পুজোয় আত্মনিয়োগ করবে? জাতি-ধর্ম- গোষ্ঠী এখন আর আঞ্চলিক ভাবে বসবাস করে না। সমগ্র বিশ্বই সকলের জন্য উন্মুক্ত। কাজেই ধর্মীয় নিয়ম কখনও সব নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধি যেমন হতে হবে অভিন্ন তেমনি শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, সর্বজনীন সংস্কৃতি আজ আর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না। কেবল ধর্ম বিশ্বাস যার যার ব্যক্তিগত অনুসরণযোগ্য থাকতে পারে। ফিলিপাইন থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র মুসলমান সমাজের এই গণতান্ত্রিক ধারা গ্রহণের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সেটাই হতে পারে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের অবসানের পথ।

সমস্ত মুসলমান প্রধান দেশ, এমনকী ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা যে প্রাযুক্তিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী ধারণ করে থাকে, যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে থাকে--- ল্যাপটপ, মোবাইল, বিমান, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশন, চিকিৎসা ব্যবস্থা এমনকী প্রমোদ উপকরণ সবই পশ্চিমী শিক্ষার ফসল। আল কায়দার প্রধান বিন লাদেন পাকিস্তানের যে দুর্গের মতো বাসস্থানে থাকতেন তার সমস্ত ব্যবস্থাই পশ্চিমী প্রযুক্তির ফসল। শরিয়তী শিক্ষায় সেই আধুনিকতার ধারে কাছেও যাওয়া যায় না। বোকো হারাম সেই পশ্চিমী শিক্ষার উপরই আক্রমণ করেছে এবং আবার করবে বলে জানিয়েছে।

কিন্তু পশ্চিমী শিক্ষা খারাপ বলে মনে করলে, শরিয়তী শিক্ষায় শিক্ষিত বোকো হারাম কি বালিকাদের অপহরণ ও তাদের ইচ্ছামতো বিয়ে করা, ধর্মান্তরিত করা এবং পরিশেষে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়াকে শরিয়তী শিক্ষা বলে মনে করে? বর্তমানে যেখানে শিশু শ্রমই অমানবিক বলে সমস্ত সভ্য দেশে নিষিদ্ধ। ক্রীতদাস তো অতীত ইতিহাসের ব্যাপার। ■

‘জনাধার’ দিয়েছে আত্মসম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহানগরে বা ছোট শহরে প্রতিদিন কয়েক টন গৃহস্থালীর আবর্জনা ও টিভি, কমপিউটারের বাতিল আবর্জনা জমা হচ্ছে। এসব আবর্জনা কোথায় ফেলা হবে, কি করা হবে তা নিয়ে পৌরসভাগুলির দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। এই আবর্জনার স্তূপ থেকে কাগজ, সিসে ও অন্যান্য সামগ্রী খুঁজে খুঁজে নিয়ে ভাঙাচোরা দোকানে বিক্রি করে পেট চালানো মানুষের সংখ্যাও শহরগুলিতে খুব বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। হিন্দু সমাজের পিছিয়ে পড়া লোকেরাই এই কাজে যুক্ত। এদের মধ্যে মহিলা ও ছোট ছোট শিশুরাও আছে। সাধারণভাবেই সমাজের চোখে এরা হীন প্রতিপন্ন হয়।

এদেরও সমাজের যোগ্য সম্মান পাওয়া দরকার ভেবে মহারাষ্ট্রের লাতুর শহরে এক সেবা সংস্থা ‘জনাধার’ শুরু হয়েছে। এই সংস্থা আবর্জনা ওঠানোদের একটি সহকারী

‘জনাধার’ কর্মী মর্মাদার সঙ্গে কাজ করছেন।

সোসাইটি গঠন করেছে। যোজনা অনুসারে আবর্জনা সংগ্রহকারী প্রত্যেক মহিলাকে ৩০০ বাড়ি থেকে আবর্জনা নিতে হবে। আবর্জনা ওঠানোর জন্য প্রতি বাড়ি থেকে প্রতি মাসে ১০ টাকা করে নিতে হবে। প্রথমদিকে এরজন্য নাগরিকদের উৎসাহিত করতে হয়েছে। তবু লোকেরা প্রশ্ন তুলেছে— পৌরসভার লোকেরা তো টাকা চায় না, আপনারা কেন টাকা চাইছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁদের বোঝানোর পর তাঁরা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

আবর্জনা ওঠানো মহিলাদের ইউনিফর্ম হিসেবে একটা জ্যাকেট, গ্লাভস্, আবর্জনা জমা করার জন্য দু’টি বড় পাত্র ও একটি ঠেলাগাড়ি সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সংস্থার কার্যকর্তারা আবর্জনা নেওয়া মহিলাদের উৎসাহিত করছেন— পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে, ঠিকমতো চুল বাঁধতে, একটু ভালো শাড়ি পরতে যাতে সমাজের লোকেরা তাঁদের সম্মানের চোখে দেখেন। শহরে এক একটি ওয়ার্ডে দশজন মহিলা কাজ করেন। কাজের তদারকির জন্য তাঁদের সমাজ থেকেই একজন একটু লেখাপড়া জানা যুবককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর জন্য এক একজন মহিলা মাসে তিন হাজার টাকা পান। এর মধ্যে থেকে ৭০ শতাংশ নিজের। ২০ শতাংশ সুপারভাইজার ও ১০ শতাংশ সংস্থার জন্য জমা করতে হয়। এর থেকে সংস্থা আবর্জনা ফেলা গাড়ি ও পাত্র কেনা এবং অফিস চালানোর জন্য খরচ করে। এর ফলে ওই মহিলাদের আগের থেকে অনেক বেশি আয় হয়। এছাড়া আবর্জনার মধ্যে থেকে বিক্রি করার সামগ্রী বেচেও তাদের দু’টি পয়সা হয়। দালাল ও ব্যবসায়ীরা খুবই কম দামে ভাঙাচোরা জিনিস কিনতো। সেজন্য সংস্থা এদেরই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ‘শোষক সহকারী সোসাইটি’ গঠন করেছে জনাধার সংস্থা। সোসাইটি নিজেই দোকান খুলে ভাঙাচোরা জিনিস বেশি দামে কেনা শুরু করে।

জনাধার পরে একটি কাঠকয়লা তৈরি করার ভাটি কিনে নেয়। কাঠকয়লা জ্বালানোর জন্য শুকনো পাতা বা আবর্জনার দরকার হয়। আবর্জনা সংগ্রহকারীদের থেকে পাওয়া শুকনো আবর্জনাগুলি ভাটির কাজে লাগে। সংস্থা এই ভাটি কুষ্ঠরোগীদের পাড়ার পাশে স্থাপন করে কুষ্ঠরোগীর পরিবাররা লোকেদের কাজ দিয়েছে। পরে তাদের ওপরই ভাটির দায়িত্ব পুরোপুরি দিয়ে দেয়।

জনাধার সংস্থা লাতুর শহরের আবর্জনা তোলা মহিলাদের জীবনে এক আশীর্বাদ স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। শহরের লোকেরা তাদের আজ ‘আপনি’ সম্বোধন করেন। কুষ্ঠরোগীদের পাড়ার আজ আর কেউ ভিক্ষা করে না। তারাও স্বাবলম্বী জীবনযাপন করছে। লাতুর শহরের এই সংস্থা আজ আশপাশের এলাকায় আশার সৃষ্টি করেছে। মহারাষ্ট্র সরকার এখন জনাধার সংস্থাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করার চিন্তাভাবনা করছে। সংস্থার সংস্থাপক সঞ্জয় কাম্বলে চাইছেন— মহারাষ্ট্রের সমস্ত শহরে এই মডেল শুরু হোক। আমাদের পাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সমাজবন্ধুরাও সম্মানের সঙ্গে বাঁচুক। ■

শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

উমেশ গোয়েঙ্কা

নিয়ামতপুর, পো ঃ সীতারামপুর, জেলা - বর্ধমান

পূজা ও দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ ক(ন ঃ-

SHREE NURSING ELECTRIC STORES

With Best Compliments From-

দীপাবলী ও পূজার অভিনন্দন গ্রহণ ক(ন ঃ—

Mohan Kumar Kedia

A Well Wisher

শিশুর কথা শেখা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে নবজাতক কান্না শুরু করে। কঠিন বাস্তব পৃথিবীতে তার আগমন হয় কান্না দিয়ে। নবজাতকের যখন এক মাস বয়স, তখন অল্প অল্প ধ্বনি বা শব্দ আওড়ায়। ধ্বনিটি আসে গলার ভেতর থেকে। এধরনের শব্দকে বলা হয় 'ওট্রাল সাউন্ড'।

পাঁচ-ছয় সপ্তাহ : পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে শিশুটি নিজস্ব কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে পারে। পাখির কূজনের মতো মধুর স্বরে কিছু বলতে চায়। গলার ভেতর থেকে গলগল করে শব্দ ব্যবহার করে অপরের কথায় সাড়া দেয়।

তিন মাস : তিনমাস থেকে শিশুরা আরও বেশি শব্দ আওড়াতে পারে। কারণ এই বয়স থেকে সে ঠোঁট, জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্রের পেশির নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই গলার ভেতর থেকে অনবরত গলগল শব্দ বের করতে কোনো অসুবিধা হয় না। নিজের সঙ্গে নিজেই কলকল শব্দ করে খেলতে থাকে। কলকল শব্দ করেই অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তারা অধীর থাকে। সাড়া পেলে আনন্দিত হয়। বাকশক্তির বিকাশের পথ ত্বরান্বিত হয়। এভাবেই শিশুর নৈকট্য আলাপচারিতা গড়ে ওঠে।

ছয় মাস : এ সময় নানা ধরনের শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যেমন মা, কাকা, দাদা। এ ধরনের ধ্বনি ব্যবহার করার প্রচুর সময় নেয়। এই বয়সেই শিশুটি খেলার সময় মুখ টিপে হাসতে পারে, ভয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠতে পারে, অথবা রাগের কারণে চেঁচাতে পারে।

সাত মাস : মাম, দাদ-দাদ, বাব-বাব এভাবে দ্বিত্বস্বরে একই ধ্বনি বার বার উচ্চারণ করতে পারে। বড়দের মুখের কথাও অনুকরণ করতে পারে।

এক বৎসর : শব্দের অর্থপূর্ণ ব্যবহার বুঝতে পারে। সাধারণ দুই তিনটি শব্দ অর্থপূর্ণ ব্যবহার বুঝতে পারে। সাধারণ দুই তিনটি শব্দ অর্থসহ বলতে পারে। যেমন, মা, আবার অর্থ বোঝার সঙ্গে তারা সাধারণ নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করে। মার কাছে যায়। বয়সের পরবর্তী ধাপে শিশুটি প্রচুর শব্দ শিখতে থাকে। শব্দ ব্যবহার করে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলার চর্চা করে। এ অবস্থায় শিশুটির নিজস্ব ভাষাশৈলী গড়ে ওঠে যার অর্থ কেবল মা-বাবা বা নিকট আত্মীয়রা বুঝতে পারে।

আঠারো মাস : ছয় থেকে কুড়িটি শব্দ বলতে পারে।

দু' বৎসর : পঞ্চাশের অধিক শব্দ ব্যবহার করতে পারে।

আড়াই বৎসর : আমি, তুমি, আমাকে, তোমাকে ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহার করতে পারে। হড়বড় করে কেবল প্রশ্ন করা শুরু করে।

তিন বৎসর : সাধারণ কথাবার্তা চালাতে পারে। অবিরাম কথা বলতে চায়।

চার বৎসর : ভাষা ব্যবহার ব্যাকরণের নিয়মনীতি শিখে ফেলে শিশুটির বক্তব্য হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ। সহজেই বক্তব্য বোঝা যায়।

তোতলানো : দু থেকে চার বছর বয়সের সময়ে তোতলা প্রক্রিয়াটি শুরু হতে পারে। যদিও এসময়ে শিশুরা অনর্গল শব্দ করতে পারে। মাঝে মাঝে শব্দ বা শব্দের অংশ বিশেষ ছাড় দিয়ে দিয়ে বার বার উচ্চারণ করতে পারে। যেন সময়ের ফাঁকটুকু নিজেদের চিন্তাগুলো খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে। একদিকে কথা বলার খুব ঝোঁক। অন্যদিকে শব্দ তৈরিতে অদক্ষতা, ভেতরের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। দ্রুততার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটির পিঠে আরেকটি শব্দ ছড়িয়ে দেয়। এটি আসল তোতলামো নয়। বরং একটি অস্থায়ী সমস্যা যা ক্রমান্বয়ে দূর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাহায্য নিলে বিশেষ উপকার হয়। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে তোতলামোর হার বেশি।

যে পরিবারের অন্য কেউ তোতলায় সেই পরিবারে সন্তানের তোতলানোর আশঙ্কা বেশি। আবেগ যদি প্রকাশের প্রতিনিয়তই বাধা পেতে থাকে তবে, তোতলামো স্থায়ী হয়ে যেতে থাকে। এক্ষেত্রেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ কার্যকর হতে পারে। অন্যদিকে প্রবৃত্তিগতভাবেই শিশুরা নতুন নতুন ধ্বনি আওড়াতে আনন্দ পায়। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। মনে প্রাণে চায় বড়রাও তার আনন্দের শরিক হোক। কিন্তু বয়স্করা তাতে অংশ না নিলে শিশুটি নতুন ধ্বনি সৃষ্টিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

বধিরতা : জন্মগতভাবে বধির হলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে কোনো সুবিধা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু কানের প্রদাহ বা জখমজনিত কারণেও অনেকে স্থায়ীভাবে বধির হয়ে পরে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থেকেও অনেক শিশু অস্থায়ী বধিরতার শিকার হয়। সেক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। ■

বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

গত ২৩ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্ণমাধব পুরে বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এবার নিয়ে গত ৯ বৎসর ধরে এই বস্ত্র বিতরণ হয়ে আসছে। এ বৎসর ৪৮ জন মহিলা ও ১২ জন শিশুকে বস্ত্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সমাজ সেবা ভারতীর সভাপতি শিবদাস বিশ্বাস এবং সহ-সভাপতি সীতেশ ভট্টাচার্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সুবল মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সীতেশ ভট্টাচার্য বলেন, দুর্গাপুজোয় নতুন বস্ত্র পরে সকলেই আনন্দ করুক, কেউ যেন বঞ্চিত না হয়, এটাই বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের ভাবনা। তিনি আরো বলেন অসুরশক্তি দমনের জন্য মা দুর্গা আবির্ভূত হয়েছিলেন। আজও অসুর শক্তি দমনের জন্য মাতৃশক্তি চাই। তবে এখন একক শক্তিতে হবে না, সংগঠিত শক্তি চাই। তাই বিচ্ছিন্ন না থেকে সকলকে সংগঠিত হয়ে থাকার আহ্বান জানান।

পুজোয় শিশুদের বস্ত্রদান

প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোয় আসানসোল জেলার বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের জামা-কাপড় দেওয়া হয়। মোট ১২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মেয়েদের জন্য ফ্রক এবং ছেলেদের জামা-প্যান্ট দেওয়া হয়। কেন্দ্রের দিদিভাইরা অনুসন্ধান করে যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন তাদের নাম পাঠানোর পর সপ্তমীর দিন স্থানীয় কার্যকর্তারা তাদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে আবেদনের মাধ্যমে ওই সামগ্রী জোগাড় করা হয়।

কাঁকসার সোয়াই গ্রামে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায় ও সমাজ সেবা ভারতীর প্রদ্যুৎমল বসু।

হুগলী জেলার মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনীর সম্মেলন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ত্রিবেণীর ওঙ্কারতলায় পরাঙ্কুশ রামানুজ জীয়র প্রতিষ্ঠিত রামানুজ সীতারাম মঠে, স্বামীজীর সুযোগ্য শিষ্য-সন্তান শ্রীমৎ গৌর রামানুজ জীয়রের তত্ত্বাবধানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হুগলী জেলার মাতৃশক্তি ও দুর্গা বাহিনীর সম্মেলন হয়। উদ্বোধনী ভাষণে বর্তমান মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ গৌর মহারাজ শ্রীশ্রী দুর্গামাতার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার সঙ্গে মাতৃশক্তির জাগরণ এবং বর্তমান সময়ে মায়েদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। ভজন-গীত পরিবেশন করেন প্রতিমা অধিকারী। পতঞ্জলি যোগকেন্দ্রের শিক্ষিকা রীতা ঘোষ যোগব্যায়াম, আসন ও প্রাণায়াম শিক্ষা দেন। দুর্গাবাহিনীর মেয়েদের নিযুদ্ধ শিক্ষা দেন টিনা অধিকারী, শুভদ্রা শর্মা ও তরুণ গোস্বামী। স্নিগ্ধা ঘোষাল ও সুলেখা চক্রবর্তী যথাক্রমে ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীশ্রীমা সারদামণি সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিরঞ্জনা চক্রবর্তী আদ্যাস্তব আবৃত্তি করেন। শ্রীমদ্ভগবতগীতা বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক অতনু চক্রবর্তী। প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের মাতৃশক্তির প্রাক্তন রাজ্য সংযোজিকা গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়। সমাপ্তি ভাষণ দেন ডুমুরদহ রামাশ্রমের শ্রীমৎ জগন্ময়ানন্দ মহারাজ। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের দুই অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে ১৪৬ জন অন্ন-প্রসাদ পেয়েছেন। সম্মেলনে অন্যদের সঙ্গে জেলা সভাপতি সহদেব ভট্টাচার্য, কার্যকরী সভাপতি সত্যগোপাল মল্লিক, জেলা উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য ও বাসুদেব ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেবা দাস ও সুভদ্রা শর্মা। আশ্রম কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।

ক্রীড়া ভারতীর রাষ্ট্রীয় ‘খেল দিবস’

বিশ্ব হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংগঠন ক্রীড়াভারতী রাষ্ট্রীয় খেলদিবস হিসেবে পালন করেছে দেশ জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের নানা অঞ্চলে বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে যথোচিত মর্যাদায় পালিত হয়েছে। কলকাতা মহানগর সমিতি মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স হলে ন'টি স্কুলকে নিয়ে এক ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। প্রায় ৫০ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক সঞ্জয় তেওয়ারি। সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের সম্পাদক তপন গাঙ্গোপাধ্যায়। ঝাড়গ্রামে মহিলাদের আন্তঃস্কুল খো খো প্রতিযোগিতা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়াসংগঠক কমলেশ চট্টোপাধ্যায় ও তপন গঙ্গোপাধ্যায়। নদীয়ার বেথুয়াডহরিতে যোগাসনের ওপর মনোজ্ঞ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডিতে কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

হয়েছে। যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হয় সেখানে। তাম্রলিপ্ত অঞ্চলের হলদিয়া, মহিষাদলের সাতটি অঞ্চলে যোগাসন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিনটি গুরুত্ব সহকারে উদযাপিত করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে ১২টি স্থানে যোগাসন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। বসিরহাটে হয় ভারত জাগো দৌড়ের কার্যক্রম। ২০ জন প্রতিযোগী এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর কর্নেল মোহনলাল যাদব।

বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অনুষ্ঠান

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদত্ত ভাষণের স্মরণে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের (কন্যাকুমারী) কলকাতা শাখা গত ৭ সেপ্টেম্বর বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে এক ভাবগম্ভীর সেমিনারের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব দিবস পালন করে। সেমিনারে ঐতিহাসিক চিরকালীন প্রভাব ও গুরুত্বে উত্তীর্ণ এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শিক্ষাবিদ রাধারমণ চক্রবর্তী। প্রকৃতপক্ষে সনাতন ভারতের বেদান্ত দর্শনের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশ্বজনীন ভাব ও শান্তির কথা তুলে ধরেছিলেন, তা আজকের যুদ্ধ, সন্ত্রাস, দাঙ্গা, দুর্নীতি পীড়িত বিশ্বমানবাত্মাকে মুক্তির দিশা দেখাতে পারে— তাঁদের বক্তব্যে এটাই ছিল মূল সুর। অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের কুশলী সংগঠক মালবিকা চট্টোপাধ্যায় সংগঠনের জন্মলগ্নের প্রেক্ষিত থেকে আজকের সর্বভারতীয় কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তুলে ধরেন তথ্য সহকারে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বৈদিক স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে নান্দীমুখটি উঁচুভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

দুর্গাপুরে সেবা প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ১৪ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুরের বিখ্যাত ভিড়িঙ্গি কালীবাড়িতে আসানসোল জেলা সেবা বিভাগের উদ্যগে একটি সেবা প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ বর্গে বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রের দাদাভাই, দিদিভাই ও সেবা বিভাগের কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। সারাদিন ব্যাপী এই বর্গে কীভাবে সঠিক উপায়ে সেবাকেন্দ্র চালানো যায় এবং সেবা দ্বারা সমাজের পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব সে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত চর্চা ও তার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সেবা কাজের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান এই বর্গের একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল। ডি এস পি ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার কমপিউটার কেন্দ্রের জন্য একটি কমপিউটার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বর্গে বেনাচিতির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীমতি সোন চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির ভাষণে সেবা কাজের গুরুত্ব ও তার বৃদ্ধির জন্য সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। নগর সঙ্ঘচালক অশোক বেরোর এবং জেলা কার্যবাহ নিরঞ্জন মাকুর এই বর্গে উপস্থিত ছিলেন। বর্গ পরিচালনা করেন প্রদ্যুৎমল বসু।

বাগবাজারে 'দেবদূত'-এর বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠান

আগের ছয় বৎসরের মতো গত ২৮ সেপ্টেম্বর সকালে 'দেবদূতের' পরিচালনায় বাগবাজার বলরাম মন্দিরের সামনে এলাকার তিন শত দরিদ্র ও পথশিশুকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ মহারাজ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার, মায়ের বাড়ি। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সায়ক গাঙ্গোপাধ্যায়, বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট সঞ্জয় ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন দেবদূতের সভাপতি ড. বিজয় আঢ্য। স্বামী বিশ্বনাথানন্দ এই রকম মহান সামাজিক কাজের সঙ্গে সকলকে যুক্ত হতে আহ্বান জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শৈলেন পাল ও দেবদূতের সম্পাদক জয়ন্ত সেন।

স্মরণ সভা

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে পূর্বতন সভাপতি শম্ভুনাথ নায়েক-এর স্মৃতিতে স্মরণসভা গত ১২ অক্টোবর বর্ধমান জেলার জামালপুরে অনুষ্ঠিত হয়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি গত ২ সেপ্টেম্বর পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যা ও সাত নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে স্মরণসভা শুরু হয়। ১৯৮১ সালে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কাজ পশ্চিমবঙ্গে যে ১৭ জন কার্যকর্তার দ্বারা শুরু হয়েছিল তাঁদের মধ্যে শম্ভুনাথ নায়েক ছিলেন একজন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত পর পর তিনবার প্রদেশ সভাপতি হয়েছিলেন। গত দুই বৎসর আগেও আলুচাষি কল্যাণ মঞ্চের উদ্যোক্তা হিসাবে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল। তিনি আমাদের একজন দক্ষ অভিভাবক ছিলেন। স্মৃতিচারণা করেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক ডাঃ চিন্ময় দত্ত, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রদেশ সংযোজক সুব্রত মণ্ডল, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকর্তা রাজকৃষ্ণ কোঙার ও অন্যান্যরা। সকলেই তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কার্যক্রম পরিচালনা করেন সুজিত কাপসি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গণেশ সাঁতরা।

Harry & Co. Trading (Kolhapur) Pvt. Ltd.

Gram : Lalchatri

2235-3641, 2235-6483

54, Ezra Street
Block D-2
Kolkata - 700 001

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

32, Ezra Street,
Room No. 854,
Kolkata - 700 001
Phone (O) 2235-0277, 9934

With Best Compliments From

R. J. Films Pvt Ltd

85, N.S. Road
3rd floor
Kolkata - 700001

শুভ দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

—জনৈক শুভানুধ্যায়ী

Lotus Rang Udyog

DEALS IN - DYES & CHEMICALS

26/4-A, Armenian Street.
Kolkata-700 001

Phone : (O) 2268-9552,

2268-2717, 2218-2931

E-mail : rangjeet.Lunia@yahoo.in

ইনচিওন এশিয়াড ভারতের কাছে ওয়েকআপ কল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ শতাধিক ক্রীড়াবিদ পাঠিয়ে একশো পদকও যদি না আসে, তবে এদেশের ক্রীড়াসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ নিতান্ত অমূলক নয়। জীবন ও সমাজের সব ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রতীকী সূচক বা মানদণ্ড হলো এশিয়াড ও অলিম্পিয়াড। সদ্য সমাপ্ত ইনচিওন এশিয়াডে ভারতের ফলাফল সেই সারসত্য প্রতিফলনে আপাত ব্যর্থ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে করার মতো গর্ব করার মতো ফল হয়েছে কিন্তু মোটের ওপর ভারতীয়দের সার্বিক পারফরমেন্স কিন্তু আশাব্যঞ্জক নয়।

শুটাররা যদি তাঁদের ওপর অর্পিত আস্থাকে কাজে পরিণত করতে পারতেন তাহলে হয়ত ইনচিওন স্বপ্নপূরণের এশিয়াড হয়ে উঠত। একমাত্র জিতুরাই ছাড়া ভারতের বিশ্ববিখ্যাত শ্যুটিং লাইন আপ সাফল্যের সরণী ধরে হাঁটতে পারেনি। পদক হয়ত এসেছে বেশ কিছু, তবে তার রঙ ও রূপ ভিন্ন। অভিনব বিন্দ্রা, গগন নারাং, মানবজিৎ সিং কেউই পোডিয়ামের সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়াতে পারেননি। জয়দীপ কর্মকার কমনওয়েলথের মতো এশিয়াড থেকেও একেবারে শূন্য হাতে ফিরেছেন। বরঞ্চ অপর টার্গেট ইভেন্ট তিরন্দাজির কমপাউন্ড বিভাগে বিরাট চমক সৃষ্টি করে ভারতীয় পুরুষ দলের সোনা জয় সোনালি রেখার দিকচিহ্ন। এই দলের তরুণ তিরন্দাজ অভিষেক ভার্মা আরো বড় সাফল্যের 'স্টেপিংস্টোন' তৈরি করতে পারেন, বলেছেন এশিয়ার সেরা শক্তি দক্ষিণ কোরিয়ার চিফ কোচ। অন্যদিকে তিরন্দাজরা নিজেদের সেরা পারফরমেন্সকেও ছুঁতে পারেননি। দীপিকা কুমারীও হতাশ করেছিল।

তবে এশিয়াডের সব সেরা গৌরবগাথা অবশ্যই হকির সোনা। একেবারে তলানিতে চলে যাওয়া মুমূর্ষু ভারতীয় হকির জন্য এই জয় অক্সিজেনের কাজ করবে। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে দুই উন্নত প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া ও পাকিস্তানকে সব বিভাগে টেক্কা দিয়ে যেভাবে জয় তুলে নিয়েছে সর্দার সিংহের

নেতৃত্বে ভারতের তরুণ ব্রিগেড, তা অবশ্যই সব দৃষ্টিকোণে প্রশংসনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। এক তো এই জয়ের ফলে আগামী রিও অলিম্পিয়াডে (২০১৬) সরাসরি খেলার যোগ্যতা পেয়ে গেল ভারত। আর দেশে হকির জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষ ফিরিয়ে আনার সহায়ক মাধ্যম এই সাফল্য। তবে এই টিমে ২-৩ জন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে নিতে হবে ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য। তাই সন্দীপ ও রাজপাল সিংহকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা দরকার।

ভারতীয় নারীর প্রেরণার আধার স্বরূপ মেরি কমের কাছে এই সোনাটি ভীষণ ভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। পাঁচবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কিন্তু মাল্টিস্পোর্টস ইভেন্টে সোনা জেতার মূল্য অন্যরকম। এর আগের এশিয়াডে ব্রোঞ্জ জিতেছেন এবার পদকের রঙ সবচেয়ে উজ্জ্বল। মেরিকমকে ঘিরে গড়ে ওঠা রূপকথার মিথ চরম সার্থকতা পেল। তবে অরিতা দেবীকে অন্যায় ভাবে হারিয়ে দেওয়া না হলে বক্সিং থেকে আরো একটি সোনা আসত। ২৮ বছর পর কুস্তির ম্যাট থেকেও সোনা এসেছে যোগেশ্বর দত্তের সৌজন্যে। কুস্তিতেও ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তাই আরো কিছু সোনার পদকের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল ভারতীয় কনটিনজেন্ট। সোনার বদলে একাধিক ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্তি যেন সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। বক্সিং থেকেও আশা করা হয়েছিল অন্তত ২টি সোনা। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বক্সিং রিংয়ে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন ভারতীয় বক্সাররা। কিন্তু এশিয়াডে ব্যর্থ।

বাঙালি সৌরভ ঘোষালের কথা না বললে এশিয়াড পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ব্যক্তিগত বিভাগে অসাধারণ খেলেও ফাইনালে কুয়েতের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে হারটা এতটাই তাতিয়ে দিয়েছিল সৌরভকে যে দলগত বিভাগের ফাইনালে সেই আবদুল্লা আল মুজায়েনকে কোর্টের মধ্যে এক প্রকার শিক্ষানবিশের পর্যায়ে নামিয়ে এনে হারিয়েছেন। পাকিস্তানের একাধিপত্য সরিয়ে ভারত এখন অভিজাত খেলা স্কোয়াশের এশিয়ার এক নম্বর শক্তি। দীপিকা পাল্লিকাল ও জ্যোৎস্না চিনাপ্পার মহিলা-দল শক্তিশালী মালয়েশিয়ার সঙ্গে অবশ্য তুল্যমূল্য লড়ে হেরে দ্বিতীয়স্থান পান। তবে অপর দুই কোর্ট ক্রাফট গেম ব্যাডমিন্টন ও টেনিসে ফল কিন্তু মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। ব্যাডমিন্টনে পুরো শক্তির দল পাঠিয়েও নামমাত্র ব্রোঞ্জ আর টেনিসে অনভিজ্ঞ, তারকাবর্জিত দলের সংগ্রহে একটি করে সোনা, রূপো ও ব্রোঞ্জ। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে ইনচিওন গিয়ে মিক্সড ডাবলসে সানিয়া মির্জা আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থেকে সঙ্গী সাকেত মিনেনির সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়া গড়ে এশিয় সেরা চিনাতাইপে জুটিকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছেন। অভিজ্ঞতার অভাবে সাকেত ও সনম সিংহের পুরুষ ডাবলস জুটি শেষ পারানির কড়ি জোগাড় করতে পারেননি।

অ্যাথলেটিক জিমনাস্টিক্স সাঁতার হলো এই ধরনের মাল্টিপল গেমসে পদক বাড়িয়ে নেওয়ার সোপান। জিমনাস্টিক্স সাঁতারে ভারতকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অ্যাথলেটিক্সে বিগত প্রতিটি এশিয়াডে ভারতীয় অ্যাথলিটরা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। এবারে যে একেবারে সবটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন তা হয়ত নয়।

ভবিষ্যতে এশিয়াডে ভারতকে যথেষ্ট মর্যাদা; সম্ভ্রমের আসনে তুলে আনার জন্য ইনচিওন থেকেই সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা নিয়ে ক্রীড়াসংস্কৃতির মান উন্নয়নে প্রয়াসী হোক সরকার এবং আই ও এ। এশিয়ান গেমস-এর জন্মদাতা ভারত। সেই দেশের সঠিক অবস্থানই কাম্য।

শব্দরূপ-৭২৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

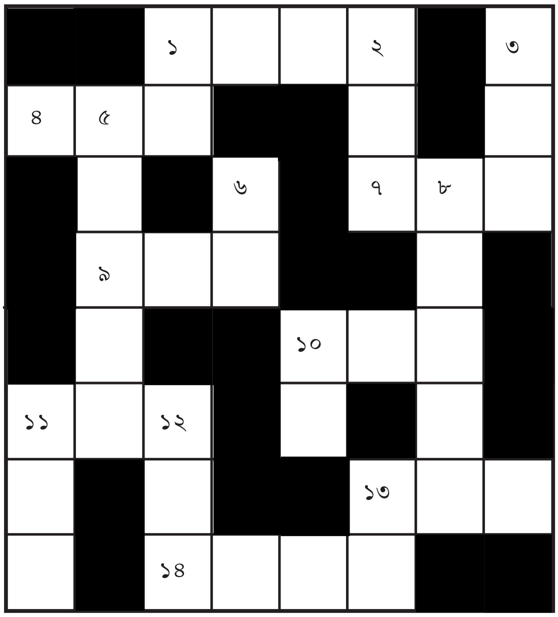

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** ‘গীতগোবিন্দ’-রচয়িতা কবি, **৪.** গায়ক ভিক্ষু সম্প্রদায়বিশেষ, **৭.** পাগল, উন্মাদ, **৯.** রাবণের মাতা, **১০.** দিবাবসান, প্রদোষ, **১১.** কাম ও প্রেমের দেবতা, **১৩.** বসন্তকালে পূজিতা মহাদেবী, **১৪.** কার্তিকেয়।

উপর-নীচ : **১.** এর অন্য নাম জীবন, **২.** পুরাণোক্ত অগ্নিমুখী সমুদ্রঘোটকী, **৩.** সগরবংশ ধ্বংসকারী মুনি, **৫.** বেদের ব্রাহ্মণভাগের শেষ অংশ বা জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত, **৬.** প্রত্যুষ, ভোরবেলা; অনিরুদ্ধপত্নী, **৮.** হিন্দি ভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা সাধক কবি, **১০.** হিমালয়-মেনকার কন্যা; পার্বতী, **১১.** বাসুকির ভগিনী, জরৎকারু-পত্নী, সর্পের দেবী, **১২.** যযাতির পিতা, **১৩.** বন্যা, জলপ্লাবন।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২১
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

					ক	শ্য	প
	ই	লি	শ		পি		র
কৃ			কা	জ	ল		শ
তা	র	কা	রি				পা
জ্ঞ				জ	য়	দ্র	থ
লি		ম	রা	ল			র
পু		লি		দ	নু	জ	
টে	নি	দা					

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

 ৭২৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ নভেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

সুনীতা ঝাওয়ার
কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী
৪২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা পুরসভা

কিশান ঝাওয়ার
উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভাপতি
বিজেপি

শুভ দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

আদিত্য টন্ডন

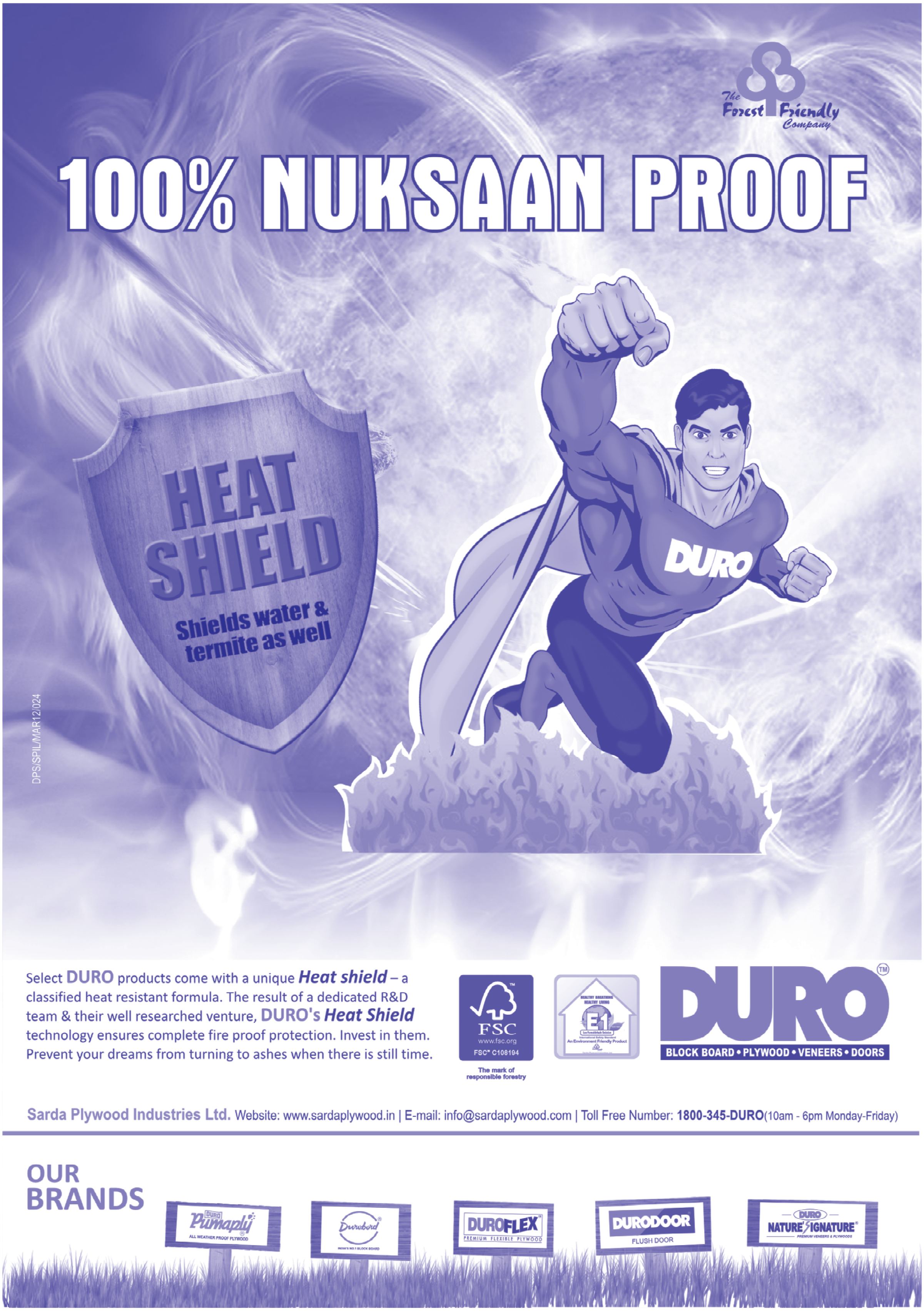
The Forest Friendly Company
100% NUKSAAN PROOF
HEAT SHIELD
Shields water & termite as well
DURO
DPS/SPIL/MAR12/2024
Select DURO products come with a unique Heat shield – a classified heat resistant formula. The result of a dedicated R&D team & their well researched venture, DURO's Heat Shield technology ensures complete fire proof protection. Invest in them. Prevent your dreams from turning to ashes when there is still time.
FSC
www.fsc.org
FSC® C108194
The mark of responsible forestry
E1
An Environment Friendly Product
DURO
BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS
Sarda Plywood Industries Ltd. Website: www.sardaplywood.in | E-mail: info@sardaplywood.com | Toll Free Number: 1800-345-DURO(10am - 6pm Monday-Friday)
OUR BRANDS
DURO Pumaply
ALL WEATHER PROOF PLYWOOD
Duroboard
DUROFLEX
PREMIUM FLEXIBLE PLYWOOD
DURODOOR
FLUSH DOOR
DURO NATURE SIGNATURE
PREMIUM VENEERS & PLYWOODS

SHREE NURSING TIMBER & ELECTRIC STORES

PODDAR COURT

18, RABINDRA SARANI, GATE NO. 4, 2ND FLOOR, ROOM NO. 7 & 8, KOLKATA - 700 001

PHONE : 2235-5210, 2235-2109, FAX : 91-33-2225-3373

e-mail : sntescal@yahoo.com, SMART - 2386

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
27 October - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা